আমার কুইজ • আমার ইচ্ছেমতো • যা হয়েছে যা হবে • ফারাক পাও

২০ জানুয়ারি ২০২০

আনন্দমেলা

জানা প্রশ্ন অজানা উত্তর

ঘুম কেন পায়? স্বপ্ন কেন দেখি? এমন বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

জমজমাট চারটি গল্প

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস

পরিবেশ
পৃথিবী এখন জতুগৃহ

রায় ও মার্টিন®

সহায়ক

Class 5 to 12

সৌগত দাস
2019 মাধ্যমিকে 1st

ক্যামেলিয়া রায়
2019 মাধ্যমিকে 3rd

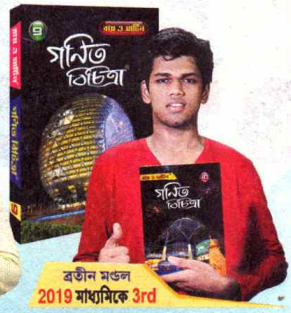

ব্রতীন মণ্ডল
2019 মাধ্যমিকে 3rd

ময়ূরাক্ষী সরকার
2018 মাধ্যমিকে 3rd

মৃন্ময় মণ্ডল
2018 মাধ্যমিকে 3rd

নীলাভ্র দাস
2018 মাধ্যমিকে 3rd

অন্বেষা পাইন
2017 মাধ্যমিকে 1st

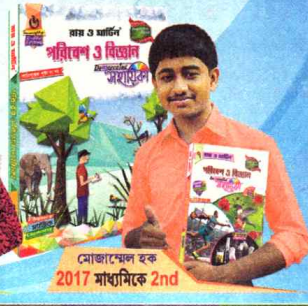

মোজাম্মেল হক
2017 মাধ্যমিকে 2nd

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get More Free eBook

VISIT WEBSITE

www.allmagazine.in

Click here

সূচিপত্র

আনন্দমেলা

৪৫ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২০ জানুয়ারি ২০২০ ৫ মাঘ ১৪২৬

প্রচ্ছদ কাহিনি

জানা প্রশ্ন অজানা উত্তর ৬

হাই, হাঁচি, হাসি কিংবা সর্দিকাশি? করছি আমার খেয়ালখুশি...কিন্তু কেন? রোজকার জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা খুব চেনা কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন **জয়াশিস ঘোষ, অচ্যুত দাস** এবং **সুদেষ্ণা ঘোষ**

জমজমাট চারটি গল্প

ফাউন্টেন পেন
সঞ্জীব চৌধুরী ১৬

পরিতোষবাবুর পাঠকেরা
দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী ২৪

রহস্য যখন ব্রেনে
কৌশানী মিত্র ৩০

শব্দ
কৌশিক সেনগুপ্ত ৪৬

পরিবেশ
পৃথিবী এখন জতুগৃহ
অচ্যুত দাস ২৬

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: www.anandamela.in

নিয়মিত বিভাগ

যা হয়েছে যা হবে ১৫
আমার স্কুল ১ ২০
আমার স্কুল ২ ২২
আমার ইচ্ছেমতো ২৯
আমার কুইজ় ৩৫
আমার শিল্পচর্চা ৪৪
ফারাক পাও, সুদোকু ৪৫
মজার ঝাঁপি ৫০
শব্দসন্ধান, নিজের হাতে ৫১
খুদে প্রতিভা ৫২
আমার বই, লাইফস্টাইল ৫৮
নতুন খেলা ৬২

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

মিশন ব্রহ্মনাদ
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৬

খেলাধুলো

রোনাল্ডোর বাজিমাত
জয়াশিস ঘোষ ৫৯

ছোট-ছোট খেলা
চন্দন রুদ্র ৬০

প্রচ্ছদ: রৌদ্র মিত্র
সম্পাদক: সিজার বাগচী
দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

জানা প্রশ্ন অজানা উত্তর

খাওয়া-ঘুম-স্বপ্ন... খুব চেনা কাজগুলোর মধ্যেও লুকিয়ে আছে অনেক অজানা বিস্ময়। কারণগুলো সংগ্রহ করলেন জয়াশিস ঘোষ, অচ্যুত দাস ও সুদেষ্ণা ঘোষ

০৬

১ রাতভর ঘুমিয়ে উঠে পড়তে বসেই চোখটা যেন আঠা দিয়ে জুড়ে আসে পিকলুর। পরীক্ষা এগিয়ে এলে বেশি-বেশি হয়। মা'র কাছে বকুনি খেতে-খেতে সে বলেই বসল সেদিন, 'ঘুম কেন পায়?'

যে ঘুমের জন্য পিকলু বকুনি খাচ্ছে, সুষম স্বাস্থ্য এবং ভাল থাকার অন্যতম প্রধান শর্ত কিন্তু সেই ঘুমই। এতটাই গুরুত্ব এর যে, সাধারণভাবে আমরা জীবনের এক-তৃতীয়াংশ ঘুমিয়ে কাটাই। তবে এই সময়টুকু চলে যাচ্ছে বলে হায়-হায় করার কারণ নেই। কেননা কার ঘুম কেমন হয়, তার উপর স্বাস্থ্য ও সারাজীবনের সুখদুঃখও নির্ভর করে। ঘুম বলতে আবছাভাবে কী বুঝি আমরা? যখন মন ও শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনই ঘুম পায়। কিন্তু তাই বলে ঘুমকে খুব নিরীহ কর্মহীন সময় ভাবার কারণ নেই। এই সময় শরীর কিন্তু দস্তুরমতো কর্মক্ষম থাকে। পেশির বৃদ্ধি, কোষকলা মেরামতি এবং হরমোনের কাজগুলো সবচেয়ে ভাল ঘুমের সময়ই ঘটে। এছাড়াও স্মৃতি সংরক্ষণ ও স্পষ্ট আকার দেওয়ার একটা সিঁড়ি হল ঘুম। সারাদিন ধরে আমাদের মস্তিষ্ক প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে। এইসব তথ্য এবং অভিজ্ঞতাগুলো মাথায় জমা ও সাজানোর প্রধান সময় হল ঘুম। সারা রাত ধরে এইসব ছোট-ছোট তথ্যগুলো স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি থেকে শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির রূপ নেয়। এই পরিবর্তনের একটা ভারিক্কি নাম আছে, কনসোলিডেশন। যাক, এত কঠিন ব্যাপারে ঢুকতে হবে না। পরীক্ষকরা দেখিয়েছেন, ঘুমের পর মানুষ নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারে বা স্মৃতিও ভাল কাজ করে। মনে করে দেখো, পরীক্ষার সময় সারাদিন পড়ে যা মনে রাখতে পার, সকালে উঠে পড়লে সেটাই কিন্তু অনেক ভালভাবে মনে থাকে। আমাদের শরীর সেজন্য বিরতিহীন দীর্ঘ ঘুম চায়।

কেননা একমাত্র এভাবেই মানুষ আবার নিজেকে ফিরে পেতে পারে আর-একটু উন্নততর রূপে। তবে এসব বলার মানে এই নয় যে, পরীক্ষার সময় ভোঁসভোঁস করে ঘুমলেই দুর্ধর্ষ রেজাল্ট হবে। দিনে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমই সুস্থ ও সুবোধ থাকতে যথেষ্ট।

২ পরীক্ষায় জানা অঙ্ক ভুল করলে কিংবা পুতুলের মাথা ভেঙে গেলে ফুঁপিয়ে কাঁদা আমাদের ন্যায্য অধিকার। কোনওদিন কি ভেবেছ, কান্না কেন পায় আমাদের?

তার আগে জেনে নিই বরং কান্না আসলে কী? চোখের কাছাকাছি অঞ্চলে রয়েছে ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ড। সেখান থেকে ক্ষরিত প্রোটিন, মিউকাস এবং তেলসমৃদ্ধ নোনতা জলের নামই কান্না। কিন্তু সব কান্নাই যে আবেগ-উৎসারিত, মানে দুঃখ বা আনন্দের, তা নয়। শারীরবিজ্ঞান বলছে, তিন ধরনের কান্না হয়। এদের প্রত্যেকেরই আলাদা-আলাদা কর্ম ও ধর্ম। যেমন, প্রথমটি হল ব্যাসাল টিয়ার্স। যে চোখের জল সবসময় সব চোখেই থাকে। তাকে শুধু বুঝি না আমরা। চোখ যাতে শুকনো না হয়, তার জন্য এই জল নানাভাবে চোখকে রক্ষা করে। মানুষের চোখ প্রতিদিন গড়ে ৫-১০ আউন্স ব্যাসাল চোখের জল তৈরি করে। এই চোখের জল অনেক সময় নাকের নালি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। যে-কারণে দুঃখের ছবি দেখে বা গল্প পড়ে আমাদের অনেকেই নাকের জলে-চোখের জলে হয়ে যায়।

আর-একধরনের কান্নার নাম রিফ্লেক্স কান্না। এটি চোখকে ধুলো, ধোঁয়া, পিঁয়াজের ঝাঁঝ বা ঝোড়ো হাওয়া থেকে বাঁচায়। এই কাজটা করার জন্য ঝড় উঠলে বা পিঁয়াজ কাটার সময় কর্নিয়ার সেন্সরি স্নায়ু মস্তিষ্ককে বার্তা পাঠায়। মস্তিষ্কের কোষ আবার চোখের পাতার গ্রন্থিতে হরমোন পাঠায়। এর ফলেই চোখে জল চলে আসে আর ধুলো বা ঝাঁঝকে চোখে ঢুকতেই দেয় না।

শেষ কান্নাটির নাম ইমোশনাল টিয়ার্স বা আবেগতাড়িত কান্না। মস্তিষ্কের যেখানে দুঃখ সঞ্চিত থাকে, সেই সেরিব্রামই এই কান্নার আঁতুরঘর। এন্ডোক্রিন সিস্টেম থেকে হরমোন বেরিয়ে অকিউলার এরিয়া অর্থাৎ চোখের আশপাশে যায়, ফলে চোখে কান্নার জন্ম হয়। কোনও জাগতিক কারণে দুঃখকষ্ট পেলে এই কান্নাটিই মানুষ কাঁদে। তবে প্রবল খুশির ফলে জাত কান্নাও কিন্তু এই কান্নার দলে আছে।

তবে কান্নার সবটাই যে দুঃখকষ্টসংক্রান্ত, তা নয়। কাঁদলে মানুষ শরীর ও মনের দিক দিয়ে ঝরঝরে হয়, অনেকেই বলে থাকেন। কোনও-কোনও বিজ্ঞানীও এব্যাপারে সহমত। কেননা দুঃখের কারণে মানুষের শরীরে ক্ষতিকারক রাসায়নিক বা টক্সিন তৈরি হয়। কান্নায় সেগুলোর মুক্তি ঘটে। সেজন্য কান্না পেলে লজ্জা না পেয়ে বরং একপ্রস্থ কেঁদে নেওয়াই ভাল, তাই না?

৩ ঋজুর ক'দিন হল খুব জ্বর। অন্ধকার ঘরে সারাদিন চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। খাবার দেখলেই বেজার-বিরক্ত হচ্ছে। বলছে, 'একটুও খিদে নেই। খাব না।' কেন বলো তো, জ্বর হলে খিদে পায় না?

তোমরা হয়তো এই প্রবাদটি শোনোনি, 'সর্দি হলে খেতে হয়, জ্বর হলে উপোস করতে হয়।' আসলে জ্বর নামক অসুখটির প্রধান উপসর্গ খিদে কমে যাওয়া। বলা যেতে পারে, দূতও। যার জন্য অনেকসময় বোঝা যায়, জ্বর মহাপ্রভুটি আসছেন। ডাক্তারি অভিমত, যখন আমরা অসুস্থ থাকি, তখন আমাদের শরীরে একটি জটিল দাহ্য ক্রিয়া হয়। এর অংশ হিসেবে আমাদের শরীর এক ধরনের রাসায়নিক নিঃসরণ করে, তার নাম সাইটোকাইন। যেটির জন্যই মূলত আমাদের খিদে কমে যায়। শারীরিক অসুস্থতার উপরে হরমোনের ক্ষরণও নির্ভর করে। এই যে তোমার খিদে কম পাচ্ছে, তার ফলে বেশ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে, তার ফলে রোগপ্রতিরোধক্ষমতা বাড়ছে। খাবার হজম করতেও খানিকটা শক্তি লাগে। সুতরাং যদি খাবারই না খাই, তা হলে বেঁচে যাওয়া শক্তি দিয়ে শরীর ইনফেকশনের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। অখিদে নাকি ভাইরাসদেরও বেশি বাড়তে দেয় না। কম খাওয়ার জন্য যেসব জিনিস ভাইরাস খায়, সেসবও তো শরীরে কম ঢোকে। একই কথা খাটে ব্যাক্টেরিয়ার ক্ষেত্রেও। কম খেলে দেহে আয়রন ও গ্লুকোজের মাত্রাও কম থাকে, যেগুলো আসলে ব্যাক্টেরিয়ার খাদ্য। ফলে তারাও বাঁচে না। এই ক্ষণস্থায়ী অখিদের ফলে দেহে দ্রুত আরোগ্য ফিরে আসে। তবে জ্বরজারির জন্য সাময়িক অখিদে ভাল হলেও দীর্ঘদিনের অখিদে কিন্তু অনেক অসুখের উপসর্গ হতে পারে।

ওজনও মারাত্মক কমে যেতে পারে।
আর এসবের মানে এই নয় যে, জ্বর হলে খাওয়াদাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে। জোর করে যদি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দাও, তা হলেও কিন্তু সুস্থ হতে অনেক দেরি হবে। তোমার যদি খিদে পায় তো নিশ্চয়ই খাবে। সঙ্গে প্রচুর জল খাওয়া ও বিশ্রামই জ্বরের নিরাময়ের জন্য দরকার।

৪ সারা সন্ধে একটানা পড়ার পর উঠতে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল বিট্টু। ঝিঁঝি ধরেছে পায়ে। মাথায় ফট করে প্রশ্ন ঢুকে গেল, ঝি ঝি ধরে কেন?
ঝিঁঝি পোকা সন্ধে হলে ডাকে। সেই ঝিঁঝি পোকার ইংরেজি নামটি কিন্তু ভারী মজার। ক্রিকেট। আবার পায়েও ঝিঁঝি ধরে। তবে এই ঝিঁঝির ইংরেজি হল প্যারেসথেসিয়া। বড়দের যদিও বেশি হয়, কিন্তু ছোটদেরও অনেকক্ষণ বসা বা শোওয়ার পর উঠতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই 'উহ্' বলে চেঁচিয়ে উঠতে হয়। হাত বা পায়ে কীসের যেন ঝনঝন আড়ষ্টতা। একটুও নাড়ানো যায় না। তখন মা বা বাবা দৌড়ে এসে বলেন, "আরে-আরে, ভয় নেই। ঝিঁঝি ধরেছে। এক্ষুনি কমে যাবে।"
কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমার হাত-পাও স্বাভাবিক হয়ে যায়। এর অনেক কারণ হয়। শরীরে ভিটামিন ই কম হয়ে গেলে নাকি ঝিঁঝি ধরতে পারে। আবার নার্ভে চোট বা রক্তচাপ বেশি হলেও ঝিঁঝি ধরে। ডায়াবেটিস বা মধুমেহও অন্যতম কারণ। তবে এসব কারণ ছাড়াও ঝিঁঝি ধরতে পারে। সাধারণত একইভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকলে ঝিঁঝি ধরে। এছাড়া যেভাবে বসা বা দাঁড়ানো শারীরবৃত্তীয়ভাবে ক্ষতিকর, যেমন কুঁজো হয়ে বসা বা একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, এসব করলে ঝিঁঝি বেশি ধরে। ওজন বেড়ে যাওয়াও ঝিঁঝি ধরার অন্যতম কারণ। আর ডাক্তারি কারণটি হল, কোনও নার্ভে বেশি চাপ পড়লে পিঞ্চড নার্ভ হয়। এই চাপের ফলে ওই স্নায়ুর কাজের জায়গায় প্যারেসথেসিয়া হয় ও ওই স্নায়ুর কাজ বন্ধ হয়। পিঞ্চড নার্ভ সারা শরীরের যে-কোনও জায়গায় হতে পারে। সাধারণত ঝিঁঝি পায়ে হলেও গলায়, পিঠে বা হাতের কবজিতেও হতে পারে।
নিয়মিত এক্সারসাইজ় করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সক্রিয় রাখলে ও সুষম খাবারদাবার খেলে ঝিঁঝির হাত থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

৫ মামাবাড়ি গেলে কিছুতেই বড়মামার সঙ্গে ঘুমোতে চায় না রিঙ্কু। উরেব্বাস, সারা রাত বড়মামা অ্যায়সা নাক ডাকে যে পাশে শুয়ে ঘুমনো যায় না! কই, রিঙ্কু তো নাক ডাকে না! কিন্তু অনেকে ডাকে কেন?
প্রায় প্রত্যেকের পাড়ায় বা পরিচিতদের মধ্যে এমন কেউ একজন থাকেন, নাসিকা গর্জনের জন্য যিনি বিখ্যাত। ঘুমের মাঝে কখনও তাঁর নাক থেকে ভেসে আসে সিংহের গর্জন, কখনও বা বাঁশির শব্দ। তা নিয়ে বিভিন্ন হাসি-ঠাট্টা হলেও বিষয়টা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এটা সেরকম জটিল কোনও রোগ না হলেও ভবিষ্যতে বিভিন্ন রোগের ইঙ্গিত হতে পারে।
ঘুমের সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টির কারণেই মূলত মানুষ নাক ডাকে। আমরা যখন ক্রমশ হালকা থেকে গভীর ঘুমের দিকে যাই, আমাদের মুখ, জিভ এবং গলার পেশিগুলো ক্রমশ শিথিল হতে শুরু করে। এর ফলে কখনও-কখনও তারা বাতাস চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধা যত বেশি হয়, বায়ু চলাচলে তত বেশি সমস্যা দেখা যায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসের ঢোকা-বেরনোর সময় এই পেশিগুলোর সঙ্গে বাতাসের ক্রমাগত ঘর্ষণ হয়। ফলস্বরূপ নাক দিয়ে বিভিন্ন আওয়াজ বেরয়, যাকে আমরা 'নাক ডাকা' বলি। এই ঘর্ষণ যত বেশি হয়, নাক ডাকার আওয়াজও তত জোরে হয়।

শুরুতে সঠিক চিকিৎসায় শ্বেতী থেকে মুক্তি

শরীরে কোন সাদা দাগ দেখলে লজ্জা বা অবহেলা নয়। আজকের উন্নত চিকিৎসায় প্রাথমিক পর্যায়ের শ্বেতীতে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। ন্যারোব্যান্ড আল্ট্রাভায়োলেট ফোটোথেরাপি এ বিষয়ে খুবই কার্যকরী। জানালেন, ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ-এর অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক ডার্মাটোলজির-র প্রেসিডেন্ট ও ওয়ার্ল্ড একজিমা কাউন্সিলের ভারতীয় প্রতিনিধি **ডা. সন্দীপন ধর**।

প্রশ্ন : শরীরের যে কোন সাদা দাগই কি শ্বেতী?

ডা. ধর : একেবারেই নয়। শরীরে নানা কারণেই সাদা দাগ হয়। যেমন, দীর্ঘদিন ধরে প্লাস্টিকের চটি পরলে পায়ে এক ধরনের সাদা দাগ হতে পারে। অনেকদিন ধরে কষে শাড়ি, সায়া বা প্যান্ট পরলে সাদা হয়ে যেতে পারে কোমরও। আবার সিঁদুর, আলতার মতো রাসায়নিক থেকেও ত্বক তার বর্ণ হারাতে পারে। এই ধরনের সাদা দাগকে বলা হয় কেমিক্যাল লিউকোডার্মা। চিকিৎসায় এসবই সেরে যায়। তাছাড়া এই দাগগুলি কখনোই শরীরে ছড়িয়ে পড়ে না। এসব দাগের সঙ্গে শ্বেতী বা ভিটিলিগোর দুধসাদা দাগের একটি পার্থক্য আছে। এই অসুখে সাদা ত্বকের লোম বা চুলগুলিও সাদা হয়ে যায়। আর চুলকানি বা অন্য কোন উপসর্গও থাকে না।

প্রশ্ন : শ্বেতীর শুরুতে তো ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন ওষুধ বা চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এরমধ্যে কোনটি বেশি কার্যকরী?

ডা. ধর : সত্যিই শ্বেতীতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। এরমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শ্বেতীতে ন্যারোব্যান্ড আল্ট্রাভায়োলেট ফোটোথেরাপি (এনবিইউভি ফোটোথেরাপি) খুবই কার্যকরী। এই ট্রিটমেন্টে ন্যারোব্যান্ড আল্ট্রাভায়োলেট রে ব্যবহার করা হয়। মূল চিকিৎসার জন্য রোগীকে কোন ওষুধ খেতে হয় না।

প্রশ্ন : কিন্তু আমরা তো জানি রোদ্দুরের আল্ট্রাভায়োলেট রের জন্যই ত্বকের ক্ষতি হয়?

ডা. ধর : ঠিকই শুনেছেন। তবে 280 থেকে 320 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্রডব্যান্ড আল্ট্রাভায়োলেট রের মধ্যে 311 থেকে 312 ন্যানোমিটার রশ্মিগুচ্ছকে ন্যারোব্যান্ড আল্ট্রাভায়োলেট রে (এনবিইউভি) বলা হয়। এই বিশেষ আলোর সাহায্যেই শ্বেতীর চিকিৎসা করা হয়।

প্রশ্ন : কিন্তু এনবিইউভি রে কিভাবে রোগীর উপর প্রয়োগ করা হয়?

ডা. ধর : বিশেষ এক ধরনের ল্যাম্প থেকে এই রশ্মি নির্গত হয়। এই মেশিনের নাম ন্যারোব্যান্ড আল্ট্রাভায়োলেট ল্যাম্প। কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনোলজির সাহায্যে ট্রেনড ফিজিসিয়ান বা নার্সেরা শ্বেতী আক্রান্ত ত্বকে খুবই সামান্য সময়ের জন্য সাবধানে এই আলো ফেলেন। তবে এটি কোন একদিনের ম্যাজিক নয়। এই ধরনের সিটিং সপ্তাহে দুই তিনটি হিসাবে তিন চারশ নিতে হয়। যাট সত্তরটি সিটিং-এর পরেই উপকার বোঝা যায়। এই রশ্মির প্রভাবে ধীরে ধীরে সাদা ত্বকের বর্ণ নির্ধারক মেলানোসাইট কোষে মেলানিন তৈরী হয়। স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে আসে। তবে এই ধরনের সব চিকিৎসার মতোই ট্রিটমেন্টটি সম্পূর্ণ করতে ধৈর্য্য ধরাটা খুব জরুরী।

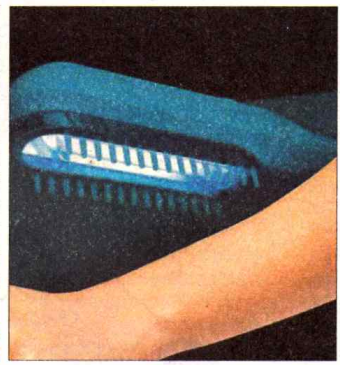

- শরীরে সাদা দাগ মানেই শ্বেতী নয়।
- শ্বেতী জীবাণুঘটিত অসুখ নয়। তাই কোনওভাবে সংক্রমণের ভয় নেই।
- শ্বেতী একধরনের অটোইমিউন ডিজিজ।
- শরীরে সাদা দাগ দেখলে লুকিয়ে না রেখে বা লজ্জা না পেয়ে প্রথমেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন : কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের রশ্মির সংস্পর্শে আসলে কোন শারীরিক ক্ষতি হয় না?

ডা. ধর : না, এই ফোটোথেরাপির কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এটি মার্কিন এফডিএ অনুমোদিত। দুই বছরের বয়সের পর থেকেই এই থেরাপি নেওয়া যায়। ছোটদের জন্য এই থেরাপি খুবই উপকারী। বড়দের ক্ষেত্রেও সমান কার্য্যকরী।

প্রশ্ন : এনবিইউভি ফোটোথেরাপি কি খুবই ব্যয়বহুল?

ডা. ধর : না, এই থেরাপির খরচ মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই।

প্রশ্ন : শ্বেতী কি কোনওভাবে একজন থেকে অন্যজনে ছড়াতে পারে?

ডা. ধর : শ্বেতী কিছুটা বংশগত কিন্তু জীবাণুঘটিত অসুখ নয় বলে কখনোই সংক্রমিত হতে পারে না। বিদেশে শ্বেতীকে অসুখ বলে মানেই করা হয় না। তাই ভয় বা লজ্জার কোন কারণ নেই। শ্বেতী রোগীর পাশে দাঁড়ান। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিন।

relation001@gmail.com

হেল্পলাইন 9874968139

(প্রিয়াঙ্কা) সকাল ১১টা থেকে রাত্রি ১০টা

তাই অনেক সময় দেখা যায়, শোওয়ার ভঙ্গিমা পালটালে নাক ডাকা কমে গিয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে নাকের হাড়ের গঠনের ত্রুটির কারণেও নাক ডাকে। নাক ডাকার ফলে স্বাভাবিক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। দীর্ঘদিন নাক ডাকলে তাই নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। রাতে ঘুম ঠিক না হওয়ায়, দিনের বেলা ঘুম পায়, মনোযোগের অভাব হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। তাই দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা হয়ে থাকলে, তা ফেলে না রেখে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

৬ পান থেকে চুন খসলেও রেগে কাঁই হয়ে যায় মিতুল। অনেকক্ষণ পর মাথাটা ঠান্ডা হলে তখন বারবার মনে হয়, হঠাৎ-হঠাৎ তার এত রাগ হয় কেন?

বড় বিপজ্জনক জিনিস এই রাগ। কখন যে কার উপর হবে, কেউ জানে না! কোথাও কিছু নেই, দিব্যি গল্প করছ কোনও বন্ধুর সঙ্গে, হঠাৎ দেখলে কথায়-কথায় রাগ হয়ে গেল তার উপর, মা এসে না থামালে হয়তো হাতাহাতিই হয়ে যেত। আবারও কখনও দেখা যায়, কেউ খুব জ্বালাতন করছে, তবুও তার উপর রাগ হচ্ছে না, বরং দিব্যি হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছ। এই রাগের পিছনে কাজ করে আমাদের মস্তিষ্কের একটা ছোট্ট অংশ, অ্যামিগডালা। এই অংশটি আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সজ্ঞানে বা অবচেতনে আমরা জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে রাখি। যখনই কোনও ঘটনার ফলাফল আগে থেকে ভেবে রাখা সেই ধারণার মতো না হয়, তখনই আমাদের রাগ হয়। আর যখন এরকম ঘটনা ঘটে, স্নায়ুর মাধ্যমে খবর পৌঁছয় মস্তিষ্কে। শুরু হয় অ্যাড্রিনালিন এবং নর-অ্যাড্রিনালিন হরমোনের ক্ষরণ। এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়, ঘন-ঘন শ্বাস পড়ে, আমাদের শরীরে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আর আমরা রেগে যাই। যে দুটো ঘটনার কথা বললাম, তার প্রথমটায় হয়তো তুমি আগে থেকে ভাবোনি যে বন্ধুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জানতে যে তোমায় নানা রকম জ্বালাতন সহ্য করতে হবে। তাই তুমি প্রথম ক্ষেত্রে রেগে গিয়েছিলে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাগ দেখাওনি। মস্তিষ্ক যেমন রাগ তৈরি করে, সেটা নিয়ন্ত্রণের উপায়ও মস্তিষ্কই করে দেয়। অ্যাড্রিনালিন এবং নর-অ্যাড্রিনালিন হরমোন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্ষরিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। শরীরের উপর থেকে এদের কার্যকারিতা কমে গেলে রাগও আস্তে-আস্তে কমে যায়।

৭ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে ভারী ভাল লাগে কোয়েলের। কখনও স্বপ্নগুলো ভয়ানকও হয়, কিন্তু ভাল হোক ছাই মন্দ, কোয়েল ভাবে, স্বপ্ন আমরা দেখি কেন?

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন আমরা কম-বেশি প্রায় সকলেই দেখি। ঘুম থেকে ওঠার পর তার কোনওটা মনে থাকে, কোনওটা থাকে না। কোনও স্বপ্নের আবার মাথামুন্ডুই খুঁজে পাওয়া যায় না! স্বপ্ন কেন দেখি, তা নিয়ে চিকিৎসক, মনোবিদরা অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঠিক কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এব্যাপারে অনেকের অনেক মত রয়েছে। মনে করা হয়, মানুষ এক রাতে তিন থেকে ছ'বার স্বপ্ন দেখে, যার প্রায় ৯৫ শতাংশই জেগে ওঠার পর মনে থাকে না। এক-একটি স্বপ্ন ৫ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। গবেষকদের মতে, আমাদের ঘুমের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সেরকমই একটা স্তরে আমাদের চোখের মণি দ্রুত নড়াচড়া করে, ঘন-ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে, হাত-পা কার্যত অসাড় হয়ে যায়। এই স্তরেই আমরা স্বপ্ন দেখি। এখানেও যাবতীয় কারিকুরির জন্য দায়ী আমাদের মস্তিষ্ক। বিজ্ঞানীদের মতে, স্বপ্ন আমাদের অবচেতনের মনের কাজ। আমরা সারাদিন অনেক কিছু দেখি বা শুনি, যার সব হয়তো মনেও থাকে না। এর সবই কিন্তু আমাদের মাথার কোনও না-কোনও প্রকোষ্ঠে জমা থাকে। আমাদের অনেক আশা-আকাঙ্খা একইভাবে জমা থাকে।

ঘুমের ওই বিশেষ স্তরে সেই ঘটনাগুলোই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই ভেসে ওঠার সময় যে ঘটনাগুলো সবসময় সুন্দরভাবে পরপর থাকে, তা নয়। অনেক সময়েই একটার ঘাড়ে আর-একটা ঘটনা উঠে একটা খিচুড়ি তৈরি করে। ফলে আমরা এমন অনেক স্বপ্ন দেখি, যার মাথামুন্ডু বুঝতে পারা যায় না। আর ঘুমের ওই অবস্থায় সব ঘটনা আমাদের মনেও থাকে না। তাই অধিকাংশ স্বপ্নই আমরা জেগে ওঠার পর ভুলে যাই।

৮ হিক! হিক! হিক্কা! একবার উঠতে শুরু করলে থামার নামগন্ধ নেই! সময়ে-অসময়ে এত হেঁচকি কেন ওঠে আমাদের?

হেঁচকি উঠতে শুরু করলেই বাড়ির বড়রা বেশি-বেশি করে জল খেতে বলেন। তাতে হেঁচকি অনেকসময় থেমেও যায়। তা হলে কি শরীরে জলের অভাব হলেই হেঁচকি ওঠে? তা কিন্তু নয়। হেঁচকির পিছনে মূলত আছে মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম) নামে পেশির পাতলা পরদার সংকোচন। এই মধ্যচ্ছদা আমাদের বক্ষগহ্বরকে উদরগহ্বর থেকে আলাদা করে। মধ্যচ্ছদার ঠিক উপরেই বুকের খাঁচায় থাকে আমাদের ফুসফুস। আমরা যখন প্রশ্বাস নিই, তখন এই মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। ফলত ফুসফুস প্রসারিত হয়ে তাতে বাতাস ঢোকে। এর ঠিক পরেই মধ্যচ্ছদা প্রসারিত হয়ে নীচ থেকে উপরের দিকে চাপ দিলে ফুসফুস থেকে বাতাস নিশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়। খাবার বা জল খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করলে পাকস্থলীতে খাবারের সঙ্গে বাতাসও ঢুকে পড়ে। ফলে পাকস্থলী প্রসারিত হয়, যার প্রভাবে মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয়ে ফুসফুসে অতিরিক্ত বাতাস ঢোকে। এই অতিরিক্ত বাতাস ঢোকা আটকানোর জন্য মুহূর্তের জন্য শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। তখনই 'হিক' শব্দ করে হেঁচকি ওঠে। একসঙ্গে অনেকটা কোল্ড ড্রিংক খেয়ে ফেললে, গরম আর ঠান্ডা খাবার পরপর খেলে, খুব ঠান্ডা জলে স্নান করলে, এমনকী, মানসিকভাবে ধাক্কা খেলেও হেঁচকি উঠতে পারে। হেঁচকি সাধারণত বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তবে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা কেটে গেলেও হেঁচকি না থামলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। মার্কিন মুলুকে চার্লস অসবোর্ন নামে এক ভদ্রলোক মাথায় হালকা চোট পেয়ে হেঁচকি তুলতে শুরু করেছিলেন ১৯২২ সালে। আনুমানিক ৪৩ কোটি বার হেঁচকি তোলার পর যা থামে ৬৮ বছর পর, ১৯৯০ সালের ৫ জুন। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী বিশ্বের দীর্ঘতম হেঁচকি এটিই। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, হেঁচকিহীন জীবন অসবোর্ন দীর্ঘদিন উপভোগ করতে পারেননি। প্রাণান্তকর ওই হেঁচকি থামার এক বছরের মধ্যেই ভদ্রলোক মারা যান।

৯ নাক টেনে-টেনে... ফ্যাচ... ও বাবা গো... হ্যাঁচ্চো! শুধু শীত বা বর্ষাতেই নয়, বছরভর আমাদের সর্দি কেন হতে থাকে?

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এই রোগ বছরে চার থেকে ছ'বার হয়। শিশুদের হয় বছরে ১০ থেকে ১২ বার! পরিসংখ্যানদুটোর দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে, এই রোগ মানুষের জীবনে ফিরে-ফিরে আসে বারবার। একজন মানুষের জীবদ্দশায় ২০০ বারেরও বেশি সর্দি হতে পারে। সর্দি হতে পারে ২০০ রকম ভাইরাসের যে-কোনও একজনের আক্রমণে। এই বিপুল সংখ্যক ভাইরাসের মধ্যে যার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি সর্দি-কাশিতে ভুগি, সেই হতচ্ছাড়ার নাম রাইনোভাইরাস। সর্দি এত বেশি হওয়ার একটা প্রধান কারণ এই যে, এই রোগ ছোঁয়াচে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা জিনিস ব্যবহার করলে বা নিদেনপক্ষে তার কাছাকাছি গেলেও সর্দিতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে।

সর্দির ভাইরাস শরীরে ঢুকলে নাক ও গলার গায়ে ডেরা বাঁধে। ভাইরাসের মোকাবিলা করার জন্য শরীর তখন শ্বেত রক্তকণিকা পাঠায়। শুরু হয় মারামারি। নাক আর গলা জ্বালা করতে শুরু করে। তৈরি হয় মিউকাস বা শ্লেষ্মা, যা কাশির সঙ্গে উঠে আসে। এই পুরো ঘটনাটায় ভাইরাসের সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধক্ষমতার দায়িত্বে থাকা সৈন্যদের ঝামেলা যত বাড়ে, ততই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ও হ্যাঁ, প্রসঙ্গত জানাই, বেশি জল ঘাঁটলে বা ঠান্ডা লাগালেই যে সর্দি হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সর্দির ভাইরাস সর্বক্ষণ আছে আমাদের আশপাশেই। শরীর কোনও কারণে দুর্বল হলে সেই ভাইরাস সহজে আমাদের কাবু করে।

কথায় বলে, সর্দি হলে ওষুধ খেলে তা সাতদিনে সেরে যায়। আর ওষুধ না খেলে সারে এক সপ্তাহে। সর্দিতে কাবু হলে সত্যিই, সাধারণত তিন থেকে সাতদিন শরীরের একটু যত্ন নিলে, বারবার গার্গল করলে, ঠান্ডা না লাগালে তা সেরেও যায়। কিন্তু সাতদিনেও সর্দি না কমলে বা সর্দির সঙ্গে জ্বর হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

১০ অপর্ণাম্যামের স্বভাব, চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে-লিখতে উনি মাঝে-মাঝে চকটা বোর্ডে ঘষে ভেঙে নেন। আর ওই শব্দেই গা-হাত-পা শিরশির করে ওঠে মাস্তর! কেন হয় এরকম?

ব্ল্যাকবোর্ডে চকের ভাঙা দিক বা হাতের নখ ঘষলে অনেকসময় 'কিইইইইচ' শব্দ তৈরি হয়, যেটা শুনে অনেকের অস্বস্তি হয়। কারও ক্ষেত্রে এই অস্বস্তি বেশি হয়, কেউ আবার বিরক্তিতে রীতিমতো কুঁকড়ে যায়। এই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য ইংরেজি বা জার্মান কোনও শব্দ নেই। স্পেনীয়রা একে বলেন 'গ্রিমা'। বিশেষ এই শব্দ শুনে কেন আমরা বিরক্ত হই, কেন আমাদের অস্বস্তি হয়, এই নিয়ে গবেষণা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ওই শব্দ শোনার সময় আমাদের মস্তিষ্কে কী-কী পরিবর্তন হয়, বিজ্ঞানীরা তা লক্ষ করেছেন। দেখা গিয়েছে, এর পিছনে আছে মানুষের মস্তিষ্কের দুটো অংশ, অ্যামিগডালা এবং অডিটরি কর্টেক্স। এদের মধ্যে অ্যামিগডালা আমাদের বিভিন্ন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, আগেই বলেছি। বোর্ডের গায়ে আঁচড়ানোর মতো তীক্ষ্ণ কোনও শব্দ শুনলে অ্যামিগডালা থেকে অডিটরি কর্টেক্সে নির্দেশ যায়, মস্তিষ্কের মধ্যে ওই শব্দের প্রভাব বাড়ানোর জন্য। এর ফলে ওই শব্দ শুনে অ্যামিগডালার প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়। কেউ ভয় পায়, কেউ কুঁকড়ে যায় অস্বস্তিতে। মানুষ সাধারণত ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে, ২০০০ থেকে ৫০০০ হার্জের কম্পাঙ্কের শব্দ শুনলেই সাধারণত আমাদের অস্বস্তি হয়। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনলেও আমাদের বিরক্ত লাগে তো? দেখা গিয়েছে, চিৎকার-চেঁচামেচির ফলে তৈরি শব্দের কম্পাঙ্কও ওই ২০০০-৫০০০ হার্জের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। অর্থাৎ, শব্দটা কী করে তৈরি হচ্ছে, সেটা জরুরি নয়। শব্দের কম্পাঙ্কটাই এক্ষেত্রে আসল। সহজভাবে বলতে গেলে, ব্ল্যাকবোর্ডে নখের আঁচড় কোনও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। তার কম্পাঙ্ক অস্বস্তিদায়ক। সেজন্যই অমন শব্দ শুনলে আমাদের অস্থির লাগে।

১১ মেজদার মনটন আজকাল ভাল থাকে না। সপ্তাহে-সপ্তাহে চিরুনি আর নারকেল তেল পালটেও কিছুতেই তার চুলপড়া কমছে না! মেজদার তাই ইদানীং একটাই প্রশ্ন, টাক পড়ার দরকারটা কী!

১৮৯৭ সালে এক ফরাসি চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করলেন, টাক পড়ার জন্য দায়ী আসলে এক অণুজীব, যাকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। সারা বিশ্বে সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল হুলস্থুল কাণ্ড! যাদের মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, তাদের চিরুনি অন্যেরা ব্যবহার করা বন্ধ করে দিল। সাবধানের মার নেই, তাই অনেকেই বলতে শুরু করলেন, চুল আঁচড়ানোর চিরুনি নিয়মিত ফুটন্ত জলে ধুয়ে নেওয়া উচিত।
অথচ সত্যিটা এই যে, টাক পড়ার জন্য আসলে দায়ী ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন (ডি এইচ টি) নামের এক হরমোন। এই হরমোনের প্রভাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ করে ছেলেদের শরীরে ত্বকের নীচে ফলিকল নামের যে অংশ থেকে চুল তৈরি হয়, তা ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। ডি এইচ টি-র জন্যই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেদের মাথার চুলের পুরুত্ব কমতে থাকে। শক্ত, মোটা চুল ক্রমশ পরিণত হয়

পাতলা, মিহি চুলে।
এবার যেহেতু সারা পৃথিবী জুড়ে অনেকের মাথাতেই এখনও দিব্যি শোভা পাচ্ছে চকচকে টাক, বিবর্তনবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, আমাদের জীবনে টাকের প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁরা একথা বিশ্বাস করেন, তাঁরা ইতিহাস বই উলটে দেখিয়েও দিতে পারেন, সে-বইয়ের পাতায়-পাতায় টাকমাথা মানুষদের সাফল্যের খতিয়ান। যাঁদের মাথায় টাক, তাঁরা বেশি পরিমাণে সূর্যালোক পান, তাই তাঁদের শরীরে বেশি-বেশি করে ভিটামিন ডি তৈরি হয়, আর তাই তাঁরা বেঁচে যান বেশ কিছু মারণরোগের হাত থেকে, এই মতবাদও বেশ চালু। কাজেই পরের বার কারও মাথায় টাক দেখলে সহানুভূতি দেখানোর আগে ভেবে দেখো, হয়তো মাথায় টাক পড়েছে বলেই লোকটা আসলে তোমার-আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল আছে।

১২ ভুলভাল সময়ে হেসে ফেলে ক্লাসে প্রায়ই কেস খায় শান্তনু! রোজ এই এক কারণে বকুনি খেতে-খেতে তার মনে হয়, হাসি না পেলেই হয়তো বাঁচা যেত শান্তিতে!

সত্যজিৎ রায়ের লেখা 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর' গল্পে অসমঞ্জবাবুর কুকুর হাসত। কুকুরের মুখ-চোখ দেখে মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন ওরাও হাসে। যদিও আনন্দ হলে দাঁত বের করে কারা হাসতে পারে, তা খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন শুধু মানুষ আর কিছু বাঁদরগোত্রীয় প্রাণীর নাম। তা বলে কি বাড়ির পোষা কুকুর-বিড়ালরা আনন্দ পেলে তা প্রকাশ করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। বিশেষ করে কুকুরদের চোখে সেই আনন্দ ফুটেও ওঠে। কিন্তু দাঁত বের করে হাসতে তারা অপারগ।

মানুষ এই একটি বিষয়ে অন্য সব প্রাণীর চেয়েই আলাদা, কারণ মানুষের ক্ষেত্রে হাসির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও চোদ্দোটা ব্যাপার। হাসির পিছনে মস্তিষ্কের কারিকুরিটার কথাই আগে বলি। খুব আনন্দের মুহূর্তে আমাদের মস্তিষ্কে ক্ষরিত হয় এন্ডরফিন হরমোন। এই হরমোনের প্রভাবেই স্নায়ুকোষেরা মুখের পেশিতে নির্দেশ পাঠায়, যার ফলে আমাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মজার ব্যাপার, ওই যে হাসলাম, সেই খবর মস্তিষ্কে যাওয়া মাত্র আরও বেশি-বেশি করে এন্ডরফিন ক্ষরিত হয়। মানে সহজ কথায়, এন্ডরফিন ক্ষরিত হলে হাসি ফুটে ওঠে। আর হাসি ফুটলে আরও বেশি এন্ডরফিন ক্ষরিত হয়। এ তো গেল হাসির পিছনে বিজ্ঞান। আর হাসির উপকারিতা? ভুরি-ভুরি উপকারের সেই লম্বা তালিকায় না ঢুকে বরং অন্য একটা খবর জানাই। চকোলেট খেতে ভালবাসা তো সবাই? তা বিজ্ঞানীরা মেলা হিসেবটিসেব করে দেখেছেন, প্রমাণ আকারের ২০০০ চকোলেট বার খেলে আমাদের মস্তিষ্ক যতটা খুশি হয়, একবার হাসলেও খুশি হয় ঠিক ততটাই। আর কে না জানে, যে লোক যত খুশি, তার জীবনও সুস্থ ততটাই।

১৩ চুল এবং নখ কাটার ঝামেলাটা থাকতই না, যদি না আপদগুলো বেড়ে যেত সারাজীবন ধরে! কেনই বা বাড়ে?

নখ কিংবা চুল বড় হওয়া নিয়ে স্কুলে স্যার-ম্যাডামের কাছে কম-বেশি বকা প্রায় সকলেই খেয়েছে। তখন নিশ্চয়ই মনে হয়, এই চুল-নখ না বাড়লেই তো ল্যাঠা চুকে যেত, কেন যে এরা সবসময় বেড়েই চলে! আসলে নখ আর চুল যে ধরনের উপকরণে তৈরি, তার জন্যই এদের এত বাড়বাড়ন্ত। আমরা জানি, চুল আর নখ তৈরি হয় মৃত কোষ দিয়ে। তাই চুল বা নখ কাটলে আমাদের লাগে না। কিন্তু খেয়াল করে দেখবে, কেউ যদি চুলে টান দেয়, তা হলে ভীষণ লাগে। কারণ, তখন চুলের গোড়ায় টান পড়ে। অর্থাৎ, চুলের যে অংশটা আমরা দেখতে পাই, সেই অংশটা মৃত হলেও গোড়ার দিকের অংশটা মোটেও মৃত নয়। একই কথা সত্যি নখের ক্ষেত্রেও।
নখ আর চুল তৈরি হয় কেরাটিন নামক একপ্রকার প্রোটিন দিয়ে। নখ বা চুলের গোড়ায় কোষগুলো জীবিতই থাকে। ক্রমাগত নতুন কোষ তৈরি হওয়ার ফলে পুরনো কোষগুলো জায়গার অভাবে বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে আর প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে মরে যায়। চুল আর নখের এই অংশটিই আমরা বাইরে

থেকে দেখতে পাই। কোষের বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। নখ আর চুলের কোষের বৃদ্ধির জন্য তুলনায় কম অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। মানুষের মৃত্যুর পর মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অক্সিজেন পৌঁছনো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ থেমে যায়। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তুলনায় অনেক কম পরিমাণ অক্সিজেন লাগার কারণে আমাদের মৃত্যুর পরেও নখ ও চুলের বৃদ্ধি কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে।

১৪ বিট্টু ছোটবেলায় ভাবত, মাথায় পাকা চুল দেখতে পাওয়া মানেই বুড়ো হয়ে যাওয়া। এখন দেখে ওর ৬৫ বছরের দাদুর মাথায় একটাও পাকা চুল নেই, কিন্তু সদ্য ৩০ পেরনো ছোটমামার মাথার প্রায় অর্ধেক সাদা! তবে কি ও ভুল জানত?

আসলে বয়সের সঙ্গে চুলের রংয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। চুলের রং নির্ধারণ করে মেলানিন নামে এক ধরনের রঞ্জক। চুলের গোড়ায় থাকা মেলানোসাইট কোষ থেকে এই রঞ্জক ক্ষরিত হয়। মেলানিন দু'ধরনের হয়। খয়েরি বা কালো রংয়ের ইউমেলানিন আর লালচে-হলুদ রংয়ের ফিওমেলানিন। এই দুই রংয়ের রঞ্জকের মিলনেই চুলের রংয়ের তারতম্য ঘটে। বোঝাই যাচ্ছে, মেলানিনের পরিমাণ কম হলে, চুলও আস্তে-আস্তে বিবর্ণ হয়ে যাবে। ধূসর রংয়ের চুলে যেমন মেলানিনের পরিমাণ কম, আবার সাদা চুলে মেলানিন একেবারেই থাকে না।

তবে এই মেলানিনের তারতম্য হয় কীভাবে? অনেকে বলেন, এটা সম্পূর্ণ জিনঘটিত ব্যাপার। বংশের পূর্বপুরুষদের অল্প বয়সে চুল পেকে গেলে, তোমারও কম বয়সে চুলে পাক ধরার সম্ভাবনা বাড়ে। আবার লাগাতার পেটের সমস্যা কিংবা অত্যধিক দুশ্চিন্তার কারণেও মেলানিন রঞ্জকের উৎপাদন কমে গিয়ে চুলে পাক ধরতে পারে। আবার অনেকে চুলে বিভিন্ন কৃত্রিম রং ব্যবহার করেন, সেই রংয়ে থাকা ক্ষতিকারক রাসায়নিকও মেলানিন উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেশ কিছু ভিটামিন, মূলত ভিটামিন বি৬, বি১২, ডি, ই এবং বায়োটিনের অভাবেও চুল সাদা হয়ে যেতে পারে।

১৫ পড়তে বসলেই ঘন-ঘন হাই তোলে রিমলি। এতই যে সেদিন পড়া থামিয়ে সে মন দিয়ে ভাবছিল, এত হাই কেন ওঠে?

ছোট্ট একটা সদ্যোজাত বাচ্চাও হাই তোলে, এটা দেখলে আমাদের সকলেরই হাসি পায়। কিন্তু হাই তোলে কেন, এটা কি ভাবি? সে তো সারাদিন ঘুমোয়, ওরও কি ঘুম পায়? অনেক রকম মত আছে। যখন আমরা খুব বিরক্ত বা ক্লান্ত হই, তখন আমরা খুব গভীরভাবে শ্বাস নিতে পারি না। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে হওয়ার ফলে শরীরে খুব কম অক্সিজেন ঢোকে। এই হাই তোলার ফলেই তখন রক্তে বেশি অক্সিজেন মেশে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যায়। হাই তোলা এক ধরনের অনিচ্ছাকৃত রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া, যার ফলে আমাদের শরীরে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা হয়। কিন্তু অন্য গবেষণা আবার উলটোদিকে দেখিয়েছে, অনেক বেশি অক্সিজেন গ্রহণ করেও হাই তোলা কমে না। জল কম খেলেও নাকি হাই ওঠে, কারণ তাতে শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। অন্য একটা মতে বলে, হাই তোলা ফুসফুসের কোষকলাদের টেনে বড় করে। এর ফলে হৃদ্‌স্পন্দন বাড়ে। মানুষ আরও বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে। আর-একটি দল মনে করে, হাই তোলা একটি রক্ষণাত্মক রিফ্লেক্স। যেটি সারফ্যাকটিন্ট নামে একটি তেলের মতো পদার্থকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, যার ফলে ফুসফুস সক্ষম থাকে। সুতরাং হাই যদি বন্ধ হয়, এই তত্ত্বের ফলে গভীর শ্বাস নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হবে। এত গুরুগম্ভীর তথ্যের পর হাইয়ের একটা তত্ত্ব কিন্তু সব্বাই মানবে। হাই সাংঘাতিক সংক্রামক। একজন হাই তুললেই কাছাকাছি অনেকেই হাই তুলতে থাকে। এমনকী, হাইয়ের কথা ভাবলেও নাকি দু'-একটা হাই তোলা হয়ে যায় অগোচরে। এই লেখাটা পড়তে-পড়তেও তোমরা হাই তুলছ নাকি?

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

যা হয়েছে

রেলে সৌরবিদ্যুৎ

গত ৯ জানুয়ারি এক বিশেষ ঘোষণা করল ভারতীয় রেলমন্ত্রক। ২০২১-২২ সালের মধ্যে আঞ্চলিক রেলে ১০০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ এবং ২০০ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ ব্যবহার করবে তারা। সেই সঙ্গে ২০২১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে রেলপথে যুক্ত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এই কাজটি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এই নতুন পথের মধ্যেই পড়বে বিশ্বের উচ্চতম ব্রিজ, যে ব্রিজটি তৈরি হয়েছে চন্দ্রভাগা নদীর উপর।

মহাকাশ নিয়ে নতুন চুক্তি

৪ জানুয়ারি মহাকাশ বিষয়ে এক নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হল ভারত এবং মঙ্গোলিয়া। এই নতুন চুক্তি অনুযায়ী, মহাশূন্যে সাধারণ মানুষের পর্যটন এবং শান্তিপূর্ণ বিভিন্ন অভিযান বিষয়ে একযোগে কাজ করবে দু'টি দেশ। এই কাজের জন্য ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) এবং মঙ্গোলিয়ার কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অথরিটি (সিটা)-র বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে একটি আলাদা দল গঠন করা হবে। এর আগে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই নতুন চুক্তিতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলেই কূটনীতিবিদদের ধারণা।

দ্বিতীয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

বছরের শুরুর দিকে ভাল খবর দিয়েই সারা বিশ্বের মহাকাশ গবেষকদের নতুন দশক শুরু হল। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হল এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, খাতায়-কলমে যার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বাস্তবে সহজে তার দেখা মেলে না। সম্প্রতি দ্বিতীয়বার সেই তরঙ্গের বাস্তব প্রমাণ পেলেন বিজ্ঞানীরা। মহাশূন্যে দু'টি তারার সংঘর্ষের ফলে এই তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে বলে তাঁদের ধারণা। পৃথিবী থেকে প্রায় ৫২ কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে তারাদু'টি। একটি তারার ভর আমাদের সূর্যের প্রায় ৩.৩ গুণ এবং অপর তারাটির ভর ৩.৭ গুণ বেশি। তবে হ্যাঁ, এবারের তরঙ্গটি প্রথমবার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া তরঙ্গের মতো অতটা শক্তিশালী নয়।

পুকুরেই হবে সামুদ্রিক মাছ

একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ পম্পানো। সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, বিশেষ পদ্ধতিতে পুকুরের জলে এই মাছের একটি বিশেষ প্রজাতির চাষ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তারা। প্রজাতিটির নাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয় পম্পানো। গবেষকদের আশা, এই পদ্ধতি মেনে পুকুরের জলে বেশি পরিমাণে চাষ করা গেলে এই মাছ চিংড়ির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যা হবে

চৈনিক নববর্ষ

ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম মাস প্রায় শেষের মুখে। এরকম সময়েই বর্ষবরণের আনন্দে মেতে উঠবেন চিনের মানুষ। চৈনিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি তাঁদের নতুন বছরের সূচনা হবে। চৈনিক প্রথা অনুযায়ী, এক-একটি বছর বরাদ্দ করা হয় এক-একটি পশুপাখির নামে। সেই অনুযায়ী আগামী ২৫ জানুয়ারি শুরু হতে চলেছে ইঁদুরের বছর। সারা চিন দেশের মানুষের কাছে এই দিনটা একটি বিশেষ আনন্দ-উৎসবের দিন। অশুভ শক্তিকে সরিয়ে শুভ শক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে এইদিন ঘরবাড়ি আলো এবং কাগজের নানা হস্তশিল্পের কাজ দিয়ে সাজানো হয়।

চিলকা পাখি উৎসব

ওড়িশার চিলকা হ্রদ দেশ-বিদেশের পক্ষিপ্রেমী মানুষদের কাছে একটি পরিচিত গন্তব্য। শীতের মরশুমে নানা জায়গার পরিযায়ী পাখির সমাগম হয় এখানে। একসময় এখানে প্রচুর পাখি শিকারিদের হাতে প্রাণও দিত। ওড়িশা সরকার এবং পরিবেশবিদদের চেষ্টায় তা এখন বন্ধ হয়েছে। এই জায়গাকে আরও প্রচারের আলোয় আনার জন্য গত কয়েক বছর ধরে ওড়িশার পর্যটন দফতরের উদ্যোগে ২৭ এবং ২৮ জানুয়ারি পালন করা হয় 'চিলকা পাখি উৎসব'। এই উৎসব এবার তৃতীয় বছরে পা দিল। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় চিত্রপ্রদর্শনী, সেমিনার, পাখি দেখার বিশেষ সফরসহ আরও অনেক কিছুর।

নাগাওর মেলা

অস্ট্রেলিয়ায় যখন দাবানলের মাঝে বেশি জল খেয়ে নেওয়ার কারণে যথেচ্ছ পরিমাণে উট মেরে ফেলা হল, সেই সময় কিন্তু উটকে নিয়ে রীতিমতো মেলা বসতে চলেছে রাজস্থানের নাগাওরে। আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি যোধপুরের কাছাকাছি এই অঞ্চলে বসবে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গবাদি পশুর মেলা। ঘোড়া, উটসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ৭০ হাজার পশুর কেনাবেচা হয় এখানে। আর এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল উটের দৌড়। এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে দেখা মিলতে পারে রাজসিক সাজে সাজানো উটের।

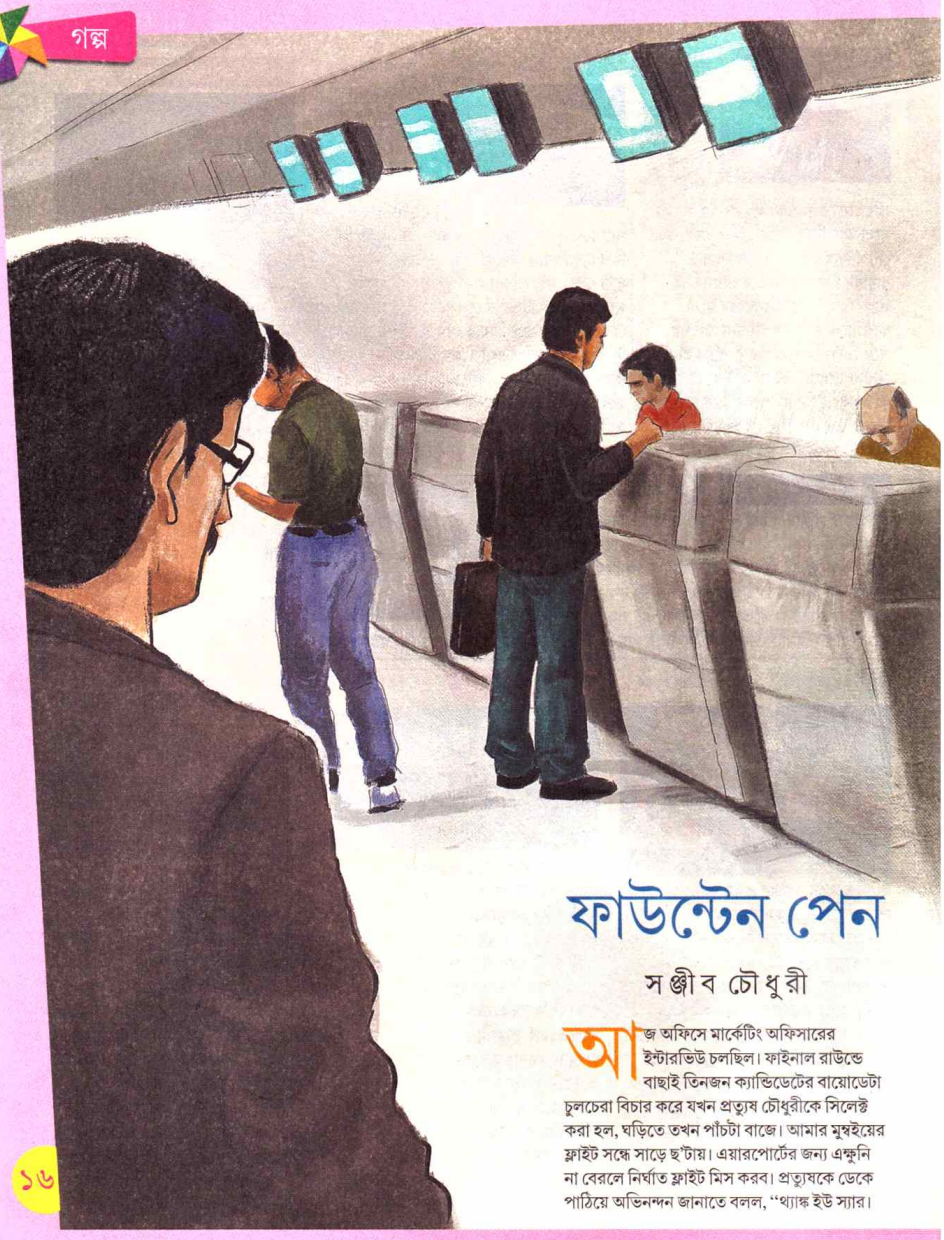

ফাউন্টেন পেন

সঞ্জীব চৌধুরী

আজ অফিসে মার্কেটিং অফিসারের ইন্টারভিউ চলছিল। ফাইনাল রাউন্ডে বাছাই তিনজন ক্যান্ডিডেটের বায়োডেটা চুলচেরা বিচার করে যখন প্রত্যুষ চৌধুরীকে সিলেক্ট করা হল, ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। আমার মুম্বইয়ের ফ্লাইট সন্ধে সাড়ে ছ'টায়। এয়ারপোর্টের জন্য এক্ষুনি না বেরলে নির্ঘাত ফ্লাইট মিস করব। প্রত্যুষকে ডেকে পাঠিয়ে অভিনন্দন জানাতে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

কবে জয়েন করতে হবে?"

হাতে আর এক মিনিটও সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে কাগজ গোছাতে-গোছাতে বললাম, "আমি আজ মুম্বই যাচ্ছি। কাল রাতে ফিরব। পরশু সকালে চলে এসো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কপিটা সই করে যাও। ডিপার্টমেন্ট বাকি পেপার্স কাল রেডি করে রাখবে।"

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কপি আর ফাউন্টেন পেনটা প্রত্যুষের দিকে এগিয়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

"হ্যাপি জার্নি স্যার। আপনার ফ্লাইট ক'টায়?"

"সাড়ে ছ'টায়। রানিং লেট। এয়ারলাইন্স ঠিক ছ'টায় কাউন্টার বন্ধ করে দেয়। বাই।"

এয়ারপোর্টে পৌঁছে কাউন্টারে গিয়ে দেখি আর-এক ভদ্রলোক চেক-ইন করছেন। কালো সুট, লেদারের অ্যাটাচি, তাড়াহুড়োয় হাঁপাচ্ছেন। নিশ্চয়ই ইনিও অফিস থেকে দেরিতে বেরিয়েছেন। ভদ্রলোক বোর্ডিং পাসটা হাতে পেয়েই এমনভাবে ছুটলেন যে, এক ধাক্কায় আমার চশমাটা ছিটকে মাটিতে। ভাগ্যিস ভাঙেনি! সরি বলা দূর অস্ত, ভদ্রলোক একবার পিছন ফিরেও তাকালেন না। তখন রাগ করারও সময় নেই। মুম্বই ফ্লাইটের লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কলের অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে।

লম্বা প্লেনটার ডানদিকে-বাঁদিকে তিনটে করে সিটের পরপর সারি। মাঝখানে যাতায়াতের প্যাসেজ। এগারো নম্বর রো-এ প্যাসেজের ধারের সিটে এক সর্দারজি বসে। আমি জানলার ধারে। মাঝের সিটটায় এখনও কেউ আসেনি দেখে ভাবলাম যাক, হাত-পা ছড়িয়ে বসা যাবে। খবরের কাগজটা সবে খুলেছি, এক ভদ্রলোক হুড়মুড়িয়ে সর্দারজিকে টপকে মাঝের সিটটায় এমনভাবে এসে বসলেন যেন ভূমিকম্প হল। দেখি, সেই কালো সুট! আমার চশমার আততায়ী।

'আর সিট পেল না, আমারই পাশে!' সর্দারজি ভদ্রলোকের অ্যাটাচির ধাক্কায় চোট পেয়ে হাঁটুতে হাত বোলাচ্ছেন। ভদ্রলোকের অভদ্রতার পরিচয় আগেই পেয়েছি। কাগজের সম্পাদকীয়তে মন দিলাম।

প্লেনের দরজা বন্ধ হল। কালো সুট যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। ভদ্রলোকের স্বভাবটাই ছটফটে। পায়ের সামনে রাখা অ্যাটাচির চেন খুলে প্রথমে চশমার খাপ, তারপর লবঙ্গর কৌটো, সিনেমার ম্যাগাজিন, চশমা মোছার কাপড়, একটার পর-একটা বের করছেন, আবার চেন বন্ধ করছেন। দৃষ্টিতেও কেমন যেন একটা অহেতুক চাঞ্চল্য। থেকে-থেকে বাঁ হাতের কনুইটা আমার কাগজের পাতাটা নাড়িয়ে দিচ্ছে। ওঁর কোনও বিকার নেই!

ছ'টা বত্রিশ। প্লেন রানওয়ের দিকে চলতে শুরু করল। সিটবেল্ট সাইনের আলোগুলো মাথার উপর সার দিয়ে জ্বলছে। একটু আগেই অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে, ইলেকট্রনিক জিনিস, যেমন ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদির ব্যবহার এখন নিষিদ্ধ। ভদ্রলোক কিন্তু ওঁর মোবাইলটা এখনও সুইচ অফ করেননি। প্লেন টেক অফ করার সময় প্যাসেঞ্জার তো বটেই, এয়ারহোস্টেসদেরও যে সিটবেল্ট বেঁধে বসে থাকতে হয়, সেটা নিশ্চয়ই ওঁর অজানা নয়। কিন্তু পরপর দু'বার এয়ারহোস্টেসকে ডাকার বোতাম টিপলেন। প্লেন আকাশে ওঠা শুরু করতেই নীচের কলকাতাটা যেন রঙিন ক্যালেন্ডারের পাতা! ভদ্রলোক এবার যা করলেন, অভাবনীয়। অ্যাটাচি থেকে ল্যাপটপ বের করে সুইচ অন করলেন। সর্দারজি ব্যাপারটা দেখেও দেখলেন না। আমার বিরক্তি বেড়েই চলেছে। কনুইয়ের গুঁতোয় কাগজটা পড়তেই পারছি না। ফ্লাইটে কোনও বাদানুবাদ আমার অশোভন লাগে বলেই চুপ করে রইলাম। ল্যাপটপটা দিব্যি চলছে। কাগজের আড়াল থেকে স্ক্রিনে চোখ পড়তেই শিরদাঁড়া দিয়ে এক ঝলক ঠান্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেল। লোকটা তো ক্রিমিনাল, মার্ডারার! ভাগ্যিস ঘাঁটাইনি! একটা সি সি টিভির ফুটেজে গভীর রাতের হাওড়া ব্রিজ। অন্ধকার গঙ্গার বুকে দু'-একটা নৌকো, স্টিমারের আলো ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে। হাওড়া স্টেশনের দিকে গঙ্গার পার বরাবর হলুদ আলোর সারি। ব্রিজের একটা চওড়া থামের আড়ালে লোকটা লুকিয়ে। পরনে এই কালো সুট, হাতেও মনে হচ্ছে এই অ্যাটাচিটাই। চোখে-মুখে হিংস্র ভাব। একজন মাঝবয়সি মহিলাকে ব্রিজের রেলিংয়ের গা ঘেঁষে হেঁটে আসতে দেখা গেল। সালোয়ার কামিজ, ভ্যানিটি ব্যাগ, আশপাশে কোনও লোক নেই। মহিলা থামের কাছাকাছি আসতেই লোকটা ক্ষিপ্র গতিতে হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে মহিলার বুকে সজোরে ছুরি বসিয়ে দিল। দু'হাতে বুক চেপে, মহিলা যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে মাটিতে পড়ে গেলেন। লোকটা অ্যাটাচি থেকে একটা তোয়ালে বের করে ছোরাটা মুড়ে নিয়ে এক ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিশ-তিরিশ সেকেন্ডের ফুটেজটা ভদ্রলোক বারবার দেখছেন আর ছুরি মারার দৃশ্যটা এলেই ডান হাত মুঠো করে সিটের হাতলে এমনভাবে ঠুকছেন যেন আক্রোশটা এখনও যায়নি। ভয়ে আমি জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসলাম।

প্লেন মেঘের স্তরের উপরে উঠতেই নীচের পৃথিবীটা হারিয়ে গেল। একটু পরেই সিটবেল্ট সাইনগুলোও নিভে গেল। সর্দারজির মাথার উপরে এয়ারহোস্টেসকে ডাকার নীল আলোটা জ্বলছে। যিনি জ্বেলেছেন, তিনি নিজের কুকীর্তির ফুটেজটা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন।

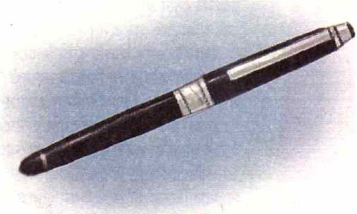

"মিঃ অমিয় রয়?"

আমার নামটা কানে আসতেই কাগজ থেকে মুখ তুললাম। একজন এয়ারহোস্টেস সর্দারজির পাশে দাঁড়িয়ে। ঠোঁটের কোনায় কৃত্রিম হাসি। আমি বলতে যাচ্ছি, "আমি কিন্তু আপনাকে ডাকিনি," লোকটা তার আগেই, "ইয়েস ম্যাডাম, মি। ওয়ান গ্লাস ওয়াটার।"

আমি তো হতভম্ব! লোকটার নাম আর আমার নাম এক? নাকি এয়ারহোস্টেসের কথা না শুনেই 'ইয়েস ম্যাডাম' বলে জল

চাইলেন? একটু পরেই এয়ারহোস্টেস ট্রে-তে এক গ্লাস জল এনে ভদ্রলোকের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলল, "মিঃ রয়, ফ্লাইট ল্যান্ড করার পর আপনি আপনার সিটেই অপেক্ষা করবেন প্লিজ়। ক্যাপ্টেনের ইনস্ট্রাকশন। থ্যাঙ্ক ইউ।"

আশ্চর্য! ভদ্রলোক এমন ভাব দেখালেন যেন এয়ারহোস্টেসের কথা শুনতেই পাননি। এক চুমুকে গ্লাসের জলটা শেষ করেই আবার ল্যাপটপ। এতক্ষণে আমি দু'য়ে-দু'য়ে চার করতে পেরে নিজেকে সতর্ক করলাম। লোকটা নিশ্চয়ই কলকাতায় কাউকে খুন করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মুম্বই পালাচ্ছে। সি সি টিভির ফুটেজটাও মনে হয় চুরি করেছে। এয়ারপোর্টে অস্বাভাবিক দৌড়নোর কারণটা এখন পরিষ্কার। শুধু তাই নয়, আমার আগে চেক-ইন করেও প্লেনে উঠেছে দরজা বন্ধ হওয়ার আগের মুহূর্তে। মানে কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিল। নিশ্চয়ই কলকাতা পুলিশ ওয়্যারলেসে ক্যাপ্টেনকে জানিয়েছে, ফ্লাইট ল্যান্ড করলেই মুম্বই পুলিশ প্লেনে উঠে গ্রেফতার করবে। সেই কারণেই ক্যাপ্টেন সিটে বসে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। ভাগ্যিস আমিও যে অমিয় রায়, সেটা এয়ারহোস্টেসকে বলে ফেলিনি! নইলে আমি যে খুনি অমিয় রায় নই সেটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত পুলিশ তো আমাকেও ছাড়ত না!

লোকটা এখন ল্যাপটপ অ্যাটাচিতে ঢুকিয়ে চুপ করে বসে। নিশ্চয়ই কোনও মতলব ভাঁজছে! পাকা ক্রিমিনাল। পাছে যেচে আলাপ করলে আমার নাম বলতে হয়, খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ঘুমনোর ভান করলাম।

সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। পাইলটের ঘোষণায় ঘুম ভাঙল, "আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাইট নামতে শুরু করবে। ছত্রপতি শিবাজি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট জানাচ্ছে আকাশ পরিষ্কার। তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস... প্যাসেঞ্জার মিঃ অমিয় রয়কে অনুরোধ, ফ্লাইট ল্যান্ড করার পর কাইন্ডলি নিজের সিটে অপেক্ষা করবেন। থ্যাঙ্ক ইউ।"

লোকটা চুপচাপ একটা ইন-ফ্লাইট ম্যাগাজ়িনের পাতা উলটোচ্ছিল। ঘোষণাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভয় পেয়েছে। বেশ কিছু প্যাসেঞ্জার মাথা ঘুরিয়ে কে 'অমিয় রায়' খোঁজার চেষ্টা করছে। হঠাৎ একটা দুশ্চিন্তা আমার মাথায় ফস করে ঢুকে গেল। 'লোকটার নাম যদি সত্যিই অমিয় রায় না হয়? ক্যাপ্টেন আমায় খুঁজছে না তো?' ক্যাপ্টেনের কাছে নিশ্চয়ই প্যাসেঞ্জারের লিস্ট আছে। দু'জন অমিয় রায় থাকলে তো এয়ারহোস্টেস আমাকেও প্লেন থেকে নামতে মানা করত! তার মানে এয়ারহোস্টেস কি এসেছিল আমারই খোঁজে? লোকটা এমন হড়বড়িয়ে

আশ্চর্য! ভদ্রলোক এমন ভাব দেখালেন যেন এয়ারহোস্টেসের কথা শুনতেই পাননি। এক চুমুকে গ্লাসের জলটা শেষ করেই আবার ল্যাপটপ। এতক্ষণে আমি দু'য়ে-দু'য়ে চার করতে পেরে নিজেকে সতর্ক করলাম। লোকটা নিশ্চয়ই কলকাতায় কাউকে খুন করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মুম্বই পালাচ্ছে।

"ইয়েস ম্যাডাম" বলল যে এয়ারহোস্টেস হয়তো ভুল করে ধরে নিয়েছে যে ও-ই অমিয় রায়! কিন্তু লোকটার নাম যদি অমিয় রায় হয়, আর যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে যে আমার নাম আর ওর নাম এক, নির্ঘাত আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে কেটে পড়বে। মার্ডার কেসের ক্রিমিনালরা সব পারে। আমি আবার ঘুমনোর ভান করলাম।

ভয় পেলে আশঙ্কা বিশ্বাসে দাঁড়ায়। আমারও তাই হল। পাইলট আমাকেই বসে থাকতে বলেছে। নিশ্চয়ই কোনও দুঃসংবাদ। ফ্লাইটে উঠেই ফোন সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম। বিমান সংস্থার স্টাফ তাই ওয়্যারলেসে পাইলটকে খবরটা পাঠিয়েছে। সকালে অফিস বেরনোর সময় বাবা বলছিলেন, বুকটা ব্যথা-ব্যথা। তাড়াহুড়োয় বলেছিলাম, "গ্যাসের ওষুধটা খেয়ে নাও, কমে যাবে। শনিবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

নিশ্চয়ই বাবার কিছু।

পিকু স্কুল থেকে মেট্রোয় বাড়ি ফেরে। মেট্রোয় তো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। পিকুর কিছু হল? এয়ারপোর্ট থেকে শম্পাকে ফোন না করে খুব ভুল করেছি। জানি না, কী শুনব! মাথাটা ঘুরছে। টয়লেটে গিয়ে মুখে-চোখে জল দেওয়া দরকার।

টয়লেটের দরজা বন্ধ। বাইরে অপেক্ষা করছি। পাশেই গ্যালিতে দেখি সেই এয়ারহোস্টেস কাজে ব্যস্ত। আমাকে দেখেই প্লাস্টিক হাসি। বললাম, "একটা প্রশ্ন করব?"

"শিয়োর।"

"আপনি আমার পাশের ভদ্রলোককে ল্যান্ডিংয়ের পর ওয়েট করতে বললেন। কী কারণে জানতে পারি?"

"ওই মিঃ অমিয় রয়? আমি তো বলতে পারব না স্যার। ক্যাপ্টেনের ইনস্ট্রাকশন।"

"উনিই যে অমিয় রায়, চিনলেন কী করে?"

"ইজ়ি। প্যাসেঞ্জার্স লিস্টে প্রথম নামটাই অমিয় রয় ছিল। ইলেভেন ব্রাভো।"

এতক্ষণে নামের ব্যাপারটা খোলসা হল। প্যাসেঞ্জার্স লিস্টটা নিশ্চয়ই অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে। এয়ারহোস্টেস যে 'অমিয় রায়' নামটা দেখেছে তার বানান নিশ্চয়ই Amiya। আমি লিখি Omio। বাকি লিস্টটা দেখার তাই প্রয়োজন মনে করেনি। কেন জানি না, বাবার মুখটা চোখের সামনে ভাসছে। এখন সবচেয়ে জরুরি হল, কী করে তাড়াতাড়ি কলকাতা ফেরা যায়! মুম্বই থেকে মাঝরাতে দু'-একটা আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কলকাতা যায়। ডিপারচার টার্মিনালে গিয়ে খোঁজ করতে হবে। নইলে কাল ভোর ছ'টার ফ্লাইটের টিকিটের চেষ্টা করতে হবে। হোটেলে না উঠে এয়ারপোর্টেই রাতটা কাটিয়ে দেব। মুম্বই অফিসকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে কাল মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারছি না। সিটে ফেরার সময় আড়চোখে দেখলাম, লোকটা ম্যাগাজ়িনের পাতায় বাংলায় 'জয় মা কালী' লিখছে।

প্লেনের চাকা মাটি ছুঁতেই মোবাইলটা অন করেছি। সঙ্গে-সঙ্গে স্ক্রিনে শম্পার নাম। বুকটা ধড়াস করে উঠল। মুখ আড়াল করে বললাম, "বলো।"

"কী করবে? রাতে তো আর ফ্লাইট

নেই। সকালের ফ্লাইট ক'টায়? টিকিট পাবে?"

ব্যস। শম্পার প্রশ্নেই সব আশঙ্কা সত্যি হয়ে গেল। গলাটাও কেমন গম্ভীর। ইশ, বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারলাম না! আজীবন আক্ষেপ করতে হবে।

"নেমে ফোন করছি।"

এরোব্রিজে প্লেন লাগতেই উঠে পড়লাম। অসম্ভব নার্ভাস লাগছে। পাইলট, কালো সুট কারও প্রতি আর কোনও আগ্রহ নেই। এখন যে কোনও উপায়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা ফেরার চেষ্টা করতে হবে। মা কী করছেন কে জানে!

এয়ারপোর্টে লাগেজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। এখান থেকে ডিপারচার টার্মিনাল যেতেও সময় লাগবে। শম্পাকে ফোন করলেই এনগেজড পাচ্ছি। বেচারার উপর দিয়ে এখন কী যাচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি। আত্মীয়স্বজনদের নিশ্চয়ই নানা অজুহাত। যা করার ওকেই করতে হবে। মাথাটা ঘুরছে। প্রেশারের ওষুধটা খেয়ে নেওয়া দরকার। পোর্টফোলিয়ো থেকে ওষুধের ব্যাগটা বের করতে যাব, কালো সুট হন্তদন্ত হয়ে গায়ের উপর এসে বললেন, "এখনও মাল আসেনি? আধঘণ্টা হতে চলল মশাই!"

"না।"

"আমি তো ভাবলুম সবাই চলে গিয়েছে। আমার মালটা না হাপিশ হয়ে যায়! এতক্ষণ প্লেনেই আটকে ছিলুম কিনা!"

কৌতূহল হল, "কেন?"

লোকটা ভিলেনের মতো খ্যাঁকখ্যাঁকিয়ে হেসে উঠল।

"ব্যামেলাটা যে কী হল, কিছুই বুঝলুম না মশাই। সব্বাই নেমে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন এসে আমার দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রথমটায় এককাঁড়ি ইংরেজি ছোটাল। যেটুকু বুঝলুম, আমি নাকি ওঁর ছেলের চাকরি করে দিয়েছি। তাই উনি আহ্লাদে আটখানা। বুঝুন গেরো! আমার নিজেরই জামিন দরকার। আমি নাকি ওঁকে বেলে খালাস করেছি! হেঁ হেঁ।"

ক্রিমিনালদের মাথায় জামিন, বেল এসব চিন্তাই স্বাভাবিক। কনভেয়ার বেল্টটা চলতে শুরু করেছে। এগিয়ে যেতেই লোকটাও পাশে এসে বলতে লাগলেন, "আমার মশাই ইংরেজিটা মোটে আসে না। যত বলি 'নো', 'নো', ততই 'থ্যাঙ্ক ইউ' দেয়! শেষকালে নিরুপায় হয়ে বাংলাতেই বললুম, 'খুব আনন্দের কথা স্যার। আপনার ছেলে যখন, সে-ও হিরের টুকরোই হবে,' ক্যাপ্টেন তখন নিজেও বাংলা ধরল। বলল, 'নিজের বলে বলছি না, ছেলেটা আমার খুব দায়িত্ববান। এই তো, আজ সবে ফ্লাইটে উঠেছি, পুতুর ফোন। বলল, চাকরিটা পেয়ে গিয়েছে, কিন্তু বস ফাউন্টেন পেনটা ওর কাছে ভুলে ফেলে গিয়েছেন। বসের নাম অমিয় রয়। আমার ফ্লাইটেই বম্বে যাচ্ছেন। আমি যেন নিজে হাতে পেনটা ফেরত দিই। গ্রাউন্ডস্টাফ ককপিটে এসে পেনটা দিয়ে গেল। ওই জন্যই তো ফ্লাইট ছাড়তে দু'মিনিট লেট হল।'"

আমার সুটকেসটা কনভেয়ার বেল্টের উপর হেলতে-দুলতে আসছে। কাছে এলেই ঝপ করে ধরব বলে পোজিশন নিলাম। পিছন থেকে ভেসে এল, "পেনটা হাতে নিয়ে দেখলুম গায়ে আমার নাম লেখা আছে বটে কিন্তু বানানটায় গড়বড়, বোয়েচেন স্যার।"

আমি আর কথা বাড়ালুম না। ভাবলুম, খ্যাপার খপ্পরে পড়ে মালটা না হাপিশ হয়ে যায়! পেনটা পকেটে পুরে চলে এলুম।"

"পেনটা একবার দেখতে পারি?"

"আলবাত দেখবেন।"

লোকটা কোটের পকেট থেকে পেনটা বের করতেই দেখি, পৈতেয় পাওয়া স্কুলের বন্ধুদের উপহার ফরাসি কলম কোম্পানির ফাউন্টেনটা। গায়ে সোনার জল দিয়ে টানা-টানা অক্ষরে লেখা Omio Roy। ততক্ষণে মনে পড়েছে, প্রত্যুষ চৌধুরীকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে সই করতে বলার সময় তাড়াহুড়োয় আমার পেনটাই দিয়েছিলাম। আরও মনে পড়ছে, ও ইন্টারভিউতে বলেছিল, ওর বাবা পাইলট। বললাম, "কিছু মনে করবেন না, এই পেনটা আমার। ক্যাপ্টেনের ছেলে আমার অফিসেই চাকরি পেয়েছে। বিকেলে সই করার জন্যে পেনটা দিয়েছিলাম। তাড়াহুড়োয়..."

ভদ্রলোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

"বাঁচালেন মশায়! বেওয়ারিশ মাল পকেটে রাখলে কেমন গা কুটকুট করে। উফ, কাঁধটা এমন ঝাঁকিয়েছে, দপ-দপ করছে!"

পকেটে মোবাইলটা বেজে উঠল। শম্পা।

"কী গো, ফোন করলে না তো! পিকুর আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে। সেই থেকে বসে আছে তোমাকে নিজে জানাবে বলে।"

শম্পার স্বাভাবিক কথায় কেউ যেন অন্ধকার বাড়িটার সব ক'টা ঘরে একসঙ্গে আলো জ্বেলে দিল। স্পষ্ট দেখলাম, বাবা আর মা বাইরের ঘরে টিভিতে আই পি এল দেখতে-দেখতে 'আ...উট' বলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন। শম্পা বেডরুমে বসে পিকুকে হোমটাস্ক করাচ্ছে। আমতা-আমতা করে বললাম, "লাগেজটা আসতে দেরি করল। পিকুকে দাও।"

"দিচ্ছি। কাল ফেরার ফ্লাইটের কী ঠিক করলে? এয়ারপোর্টে কখন গাড়ি পাঠাব?"

"আচ্ছা, তুমি ফেরার ফ্লাইটের কথা কেন জিজ্ঞেস করছ বল তো? আমার তো কাল ইভনিং..."

"ও মা, সে কী! তোমাকে অফিস থেকে ফোন করেনি? আমাকে তো সন্ধেবেলাই তোমার সেক্রেটারি ফোন করে বললেন, 'ম্যাম, স্যারের ফোনটা সুইচড অফ। মনে হচ্ছে ফ্লাইটে আছেন। কাল বোর্ড মিটিং বাতিল হয়েছে। আপনার সঙ্গে কথা হলে প্লিজ জানিয়ে দেবেন। আমিও চেষ্টা করছি।'"

লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় অমিয় রায়ের সঙ্গে আলাপ হল। বরানগরে বাড়ি। স্কুল পালিয়ে বম্বে গিয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল সিনেমার হিরো হয়ে ফিরবেন। সেই থেকে মুম্বইয়ের শ্রী গণেশ স্টুডিয়োয় লাইটম্যানের চাকরি। ফ্লোরে এক্সট্রার অভিনয়ও করেন। পরিবার কলকাতায়। বললেন, "একটা ফিল্মে রাতের হাওড়া ব্রিজে ভিলেনের খুনের দৃশ্য ছিল। প্রোডিউসার বলল, 'অমিয়দা, হাওড়া ব্রিজের সেট বানাতে কাঁড়ি খরচ। লোকেশনে শট হলে সিনটা জমবেও ভাল। ড্রেসারকে বলে ভিলেনের কালো সুট আর অ্যাটাচি নিয়ে কলকাতা চলে যান। লোকাল ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে শটটা টেক করে নিয়ে আসুন।' ঘুরে এলুম। মুফতে আর-একবার প্লেনে চড়া তো হলই, মিসেসকেও সিনেমায় নামিয়ে দিলুম। রথ দেখা আর কলা বেচা। কী বুঝলেন?"

ছবি: রৌদ্র মিত্র

ড্যাফোডিলস স্কুল, শিলচর

শুধু লেখাপড়াই নয়, তার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে বিগত ২৫ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে শিলচরের এই স্কুল।

আসমের কাছাড় জেলার একটি শহর শিলচর। আজ থেকে প্রায় ২৫-২৬ বছর আগে শিলচরে ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল হাতেগোনা কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। সেখানকার মালুগ্রাম এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক স্বর্গীয় নির্মলেন্দু দে-র মনে হয়েছিল, এর ফলে এলাকার স্থানীয় বাচ্চাদের ইংরেজি শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটছে। সেই সমস্যা মেটাতে ১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি নিজের বাড়ির একটি অংশে তাঁর উদ্যোগেই চালু হয় ড্যাফোডিলস স্কুল। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা তখন নামমাত্র। ক্লাস বলতে শুধু নার্সারি ক্লাস। তবে প্রথম থেকেই স্কুলের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যত্ন আর ভালবাসা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্কুলটি আস্তে-আস্তে উন্নতি করতে থাকে। ২০০১ সালে ড্যাফোডিলস স্কুল হাই স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। ততদিনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে অনেকটাই। ২০০৫ সালে বহু অপেক্ষার পর আসে এক স্মরণীয় মুহূর্ত। প্রথমবারের মতো ছাত্রছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়। আর প্রত্যেকেই সাফল্যের সঙ্গে পাশ করে। এইভাবে স্কুলটি পূর্ণতা লাভ করে আর স্বর্গীয় নির্মলেন্দু দে-র স্বপ্ন বাস্তব হয়।

বর্তমানে এই স্কুলটি শিলচর শহরের খ্যাতনামা স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। একসময়ে একটি বসতবাড়ির একাংশে যে স্কুল শুরু হয়েছিল, আজ তার পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত। এখানে বিশাল স্কুল চত্বরের একপাশে রয়েছে একটি তিনতলা বাড়ি আর অন্যদিকে একটি চারতলা বাড়ি। দু'য়ের মাঝে ছেলেমেয়েদের খেলার জন্য একটা বড় মাঠ। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২০০। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস হয় এখন। বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার, একটি ল্যাবরেটরির পাশাপাশি রয়েছে একটি বড় হলঘর, যেখানে নানা রকম অনুষ্ঠান হয়। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৪৫ জন। প্রধান শিক্ষকের নাম সুব্রত দে। তিনি ২০০৪ সাল থেকে এই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন।

তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা স্কুলের উন্নতি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্কুলের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ড্যাফোডিলস এডুকেশনাল ট্রাস্ট। স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। সেই কারণেই নাচ, গান, আবৃত্তি, যোগব্যায়াম, খেলাধুলো, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ের নিয়মিত চর্চা হয়। এজন্য সপ্তাহে একদিন করে প্রতি ক্লাসে একটা পিরিয়ড বরাদ্দ রয়েছে। বছরে একবার করে চারু তথা কারুশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শহরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যও অর্জন করে। মাধ্যমিকে স্কুলের ফলাফল বরাবরই ভাল। ২০১০ সালে এখানকার ছাত্রী বৈশাখী শুক্লবৈদ্য মেধাতালিকায় স্থান লাভ করে। এছাড়া বিগত পাঁচ বছরে মাধ্যমিকে পাশের হার একশো শতাংশ। এর মধ্যে অনেকেই ডিস্টিংশন, স্টার, লেটার মার্ক পেয়ে পাশ করেছে। প্রতি বছর মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যার বেশির ভাগই প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

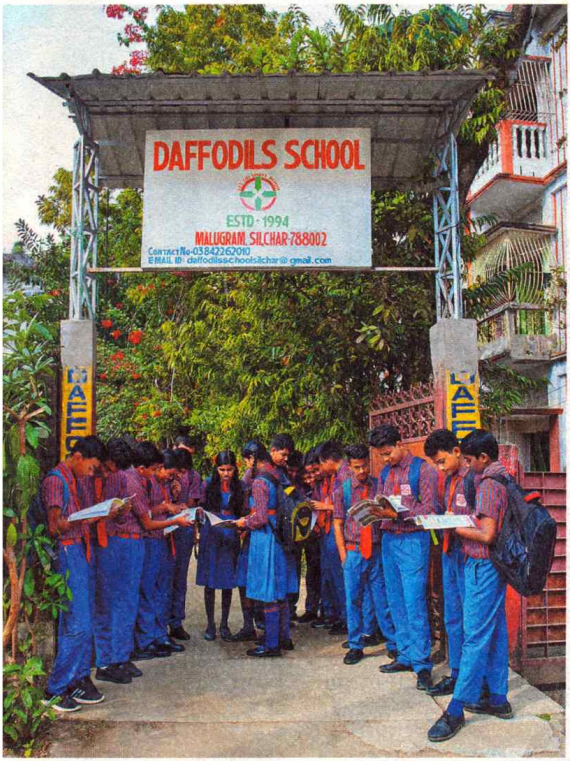

লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলে সারাবছরব্যাপী নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সরকারি কর্মসূচি অনুযায়ী সব রকমের অনুষ্ঠান এই স্কুলে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। এছাড়াও নানা ধরনের সামাজিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে ড্যাফোডিলস মিনি কার্নিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরাও অংশগ্রহণ করেন। এর থেকে প্রাপ্ত অর্থের একাংশ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সংস্থায় দান করা হয়। 'এক্সপ্রেশন' নামে স্কুলের একটি নিজস্ব ত্রৈমাসিক পত্রিকা রয়েছে।

বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় তিনদিন ধরে। এই বছর আন্তঃস্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়েছে। এতে শহরের বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা জেলাস্তরে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। শহরের বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেকেই এখানে পড়তে আসে। উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রয়েছে কম্পিউটার এবং স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা।

২০১৯ থেকে ড্যাফোডিল স্কুল বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রজতজয়ন্তীবর্ষ উদ্‌যাপন করছে। এই উপলক্ষে সারা বছরব্যাপী নানা আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, যেমন, পুষ্প প্রদর্শনী, বাংলা বর্ষবরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যামূলক প্রতিযোগিতা, পরিবেশ দিবস, শিশুদের 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতা, চারু-কারুশিল্প প্রদর্শনী ইত্যাদি উদ্‌যাপিত হয়েছে। এছাড়াও এই উপলক্ষে মাতৃভাষা দিবসে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। নাটক, সিনেমা নির্দেশনার উপর বিভিন্ন কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে একটি প্রোজেক্ট প্রতিযোগিতায় এই স্কুল দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। স্কুলটি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধ শিক্ষার দশটি স্কুলের অন্যতম একটি স্কুল। আগামী ২৫ থেকে ৩১ জানুয়ারি স্কুলের রজতজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে এক মহাসমারোহের আয়োজন করা হয়েছে। এতে থাকবে ট্যাবলো সহযোগে র‍্যালি, গুণীজন সম্বর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা উন্মোচন, পুরস্কার বিতরণী উৎসবসহ আরও অনেক কিছু। আগামী দিনে স্কুলের

সকল অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং সর্বস্তরের সমাজসচেতন নাগরিকবৃন্দের সহযোগিতা এবং ভালবাসা নিয়ে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে এই স্কুল, এমনটাই আশা সুব্রতবাবুর।

নিজস্ব প্রতিনিধি

অশোকনগর বাণীপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

৭০ বছর পেরিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অশোকনগরের নামী স্কুলটি।

বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা মৌমিতা চক্রবর্তী কাজে যোগ দিয়েছেন ছ'মাস আগে। তিনি জানালেন, এবছর ৭০ বছর পূর্ণ করছে এই স্কুল। ১৯৫০ সালের ২০ নভেম্বর শুরু হয় স্কুলটি। তখনকার নাম ছিল হাবড়া আর্বান কলোনি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে এসে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি হয় স্কুলটি। এই অঞ্চলে তখন ১৫০টি বাড়ি এবং ২০০টির মতো পরিবার। নাগরিক শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে শুরু হলেও পরে নাগরিক শিক্ষা সংঘ ৬০টাকার তহবিল গড়ে স্কুলটি গড়ে তোলেন। তবে শুরুর পথটা বেশ কঠিনই ছিল। স্কুলের নিজস্ব বাড়ি ছিল না। এমনকী, স্কুলের ঘণ্টাটিও ছিল স্থানীয় একটি বাড়ির। নলিনীমোহন কর, অমূল্য চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত সেন, ডঃ শীতল বসু, রায়সাহেব সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতো গণ্যমান্যরা স্কুলটির জন্মলাভ ও বিস্তারের পিছনে ছিলেন। কার্যকরী প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন বিন্দু চৌধুরী।

মৌমিতা চক্রবর্তী

প্রথম প্রধান শিক্ষক নিশিকান্ত সেন। ননী কর ছিলেন একইসঙ্গে এখানকার বিধায়ক ও শিক্ষক। এই স্কুল গড়ে তোলার পিছনে তাঁর অবদান এখনও স্মরণীয়। এছাড়া ছিলেন সন্তোষকুমার সেন, নরেশচন্দ্র কর প্রমুখের মতো অসংখ্য শিক্ষাব্রতী মানুষ।

এ অঞ্চলে মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল এটি। বাণীপীঠ নাম হয় পরে। তার আগে এটা সহশিক্ষার স্কুল ছিল। প্রথমে স্কুলটি ছিল শিশুশ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। পরে সরকারি অনুমোদনের সময় তিনটি ভাগ হল। প্রাথমিক ভাগটি হল মর্নিং, বাণীপীঠ ফর বয়েজ়। ডে সেকশনটি বাণীপীঠ ফর গার্লস। একদম প্রাইমারিটি আলাদা হয়ে গেল বাণীপীঠ প্রাইমারি নামে। ১৯৫৩-এ দশম শ্রেণি, '৬১ সালে একাদশ শ্রেণির কলাবিভাগ, '৬২তে বিজ্ঞান ও '৬৩-তে বাণিজ্য শাখার সরকারি অনুমোদন মেলে স্কুলের।

এখনকার শিক্ষিকারা মুক্তকণ্ঠে জানালেন, স্কুলটি আজ অঞ্চলের অন্যতম সেরা হওয়ার পিছনে রয়েছে একদা প্রধান শিক্ষিকা বীণাপাণি নন্দীর বিশাল ভূমিকা। স্কুলটিকে নতুন করে গড়ে তোলেন তিনি। এছাড়া অবশ্যই নাম করতে হয় দেবী ঘোষের। নকশাল আমলে স্কুলটিতে ডিনামাইট চার্জ হয়েছিল। আগুন লেগে ক্ষয়ক্ষতিও হয় বিস্তর। তারপরও ভাবলে অবাক লাগে, আজ তেরো বিঘা জমির উপর এই স্কুলে ১৭০০-র উপর ছাত্রীসংখ্যা। অনেক দুর্গম পথ পেরিয়ে আজ এই সুনাম অর্জন করতে পেরেছে স্কুল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি ছাত্রীসংখ্যা এই স্কুলেই। রেজ়াল্টও সবচেয়ে ভাল হয় এই স্কুলেরই। স্কুলের চারদিকে প্রচুর গাছপালা। ঘন সবুজমাখা স্কুলের পরিবেশটি ভারী মনোরম।

যুগের সঙ্গে তাল মেলায় স্কুলটি। প্রধান শিক্ষিকা জানালেন, সম্প্রতি তিনদিনের ক্যারাটে ওয়ার্কশপ হয়েছে স্কুলে। অভিভাবক-শিক্ষকদের মিটিংয়ে ক্যারাটে ক্লাসকে হয়তো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে শিগগিরি।

বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয় প্রতি বছর জুন-জুলাই মাসে। এবার স্কুলের ৭০ বছর পূর্তি বলে যে অনুষ্ঠান দু'দিন হওয়ার কথা। এছাড়া ২৩ জানুয়ারি, ২৬ জানুয়ারি, রবীন্দ্রজয়ন্তী সব অনুষ্ঠানই স্কুলের ছাত্রীরা পালন করে। স্কুল ম্যাগাজ়িনের নাম বাণী।

এছাড়া নাটকে আগ্রহী যারা, তাদের

জন্য সপ্তাহে দু'দিন নাটকের ক্লাস হওয়ার কথা চলছে। স্কুলে হাউজ় না থাকলেও চাইল্ড ক্যাবিনেট রয়েছে। এই চাইল্ড ক্যাবিনেটের উপর শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব। নির্মল বিদ্যালয় রয়েছে স্কুলের রুটিনে। সপ্তাহে একদিন করে মেয়েদের উপর ক্লাসরুম পরিষ্কার করার দায়িত্ব থাকে। ক্লাসটিচারের দায়িত্বে কাজটা সম্পন্ন হয়। মৌমিতাদেবী জানালেন, পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় মেয়েরা বেশ উৎসাহী। তিনি আরও বলেন, নিজের ক্লাস নিজে ঝাঁট দিলে স্কুল নোংরা কম হয়। এছাড়া পানীয় জলবাহিত রোগ আটকাতে স্কুলে ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানো আছে। নিরাপত্তার তাগিদে সি সি টিভি ক্যামেরাও জানুয়ারির মধ্যেই বসানো শেষ হবে। স্কুলে সব মিলিয়ে আছেন ৩৫জন শিক্ষিকা। এছাড়া তিনজন কম্পিউটার টিচার আছেন। এঁরা সবাই ছাত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে যত্ন করেন, প্রয়োজনমতো বকুনিও দেন। স্কুলে লাইব্রেরি ক্লাস হয়। লাইব্রেরিতে মেয়েরা লেখাপড়া করে। বইয়ের সংগ্রহ প্রায় ১০,০০০।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে বাণীপীঠ স্কুল। মেয়েরা এবছর যাচ্ছে বিড়লা সায়েন্স মিউজ়িয়ামে। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মেয়েদের সমস্যার কথা জানা ও সমাধান করা হয়। স্কুলে কম্পিউটার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূগোল, নিউট্রিশনের আলাদা ল্যাব আছে। প্রযুক্তিগতভাবে স্কুলটি এগিয়ে যাচ্ছে। স্মার্ট ক্লাস এখনও হয়নি। তবে প্রোজেক্টর আছে। সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে সারা স্কুলে। অডিয়ো-ভিজুয়ালের মাধ্যমে পড়ানো হলে ব্যাপারটা অনেক বেশি আগ্রহোদ্দীপক হত বলে জানালেন প্রধান শিক্ষিকা। সেজন্য আলাদা গ্রান্টের প্রয়োজনও রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে স্কুলের সবাই উত্তীর্ণ হয়। অতীতে মেধাতালিকায় দ্বাদশ স্থানে ছিল এই স্কুলের মেয়ে। পুরনোদের মধ্যে ব্রততী মুখোপাধ্যায় আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, বুলবুল মুখোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপিকা। এছাড়া শুচিস্মিতা চক্রবর্তী, ডঃ কোয়েলা সরকার ডাক্তার।

খেলাধুলোয় স্কুলের কবাডি টিম জেলায় চ্যাম্পিয়ন। স্কুলে জিম আছে। মৌমিতাদেবী বললেন, মেয়েরা এখন জিমে শরীরচর্চায় খুব আগ্রহী। তবে সেই সঙ্গে নানা সুকুমারচর্চাতেও তারা পিছিয়ে নেই। রাজ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের এক্সটেম্পোতে প্রথম পুরস্কার নিয়ে এসেছে এই স্কুলের পড়ুয়া। এবার সে মাধ্যমিক দেবে। ২০১৫ সালে স্কুল নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার ও ২০১৬-য় শিশুমিত্র পুরস্কার পেয়েছে। অনেকেই কুইজ় প্রতিযোগিতায় প্রাইজ় আনে। লেখাপড়ায় ভাল না হলেও কেউ যদি খেলাধুলোয় পটু হয়, তা হলে সেদিকেই তাদের উৎসাহিত করা হয়। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর। কাছাকাছি অঞ্চল ছাড়াও গুমা, হাবড়ার মতো দূরদূরান্ত থেকেও মেয়েরা আসে। সেজন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ার চাপ। এক-একটা ক্লাসে রয়েছে তিনটে করে সেকশন।

লেখাপড়ার মাথা সকলের থাকে না। কিন্তু বাধ্য হওয়া, নম্র হওয়া, ভালমানুষ হওয়াই ছাত্রীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

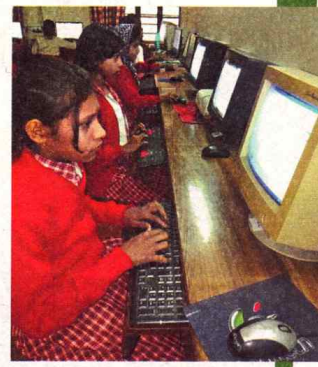

তাদের উদ্দেশে এই বার্তাই দিলেন প্রধান শিক্ষিকা, "সমাজে ভালমানুষের দরকার। লেখাপড়ায় ভাল হয়ে বাবা-মাকে দেখলাম না, এটা মানুষ হওয়ার লক্ষণ নয়। বই পড়ার অভ্যেস করা দরকার। অভিভাবকদেরও সতর্ক হওয়ার দরকার আছে। ছোটবেলা থেকে এইসব অভ্যেস করে দেওয়ার খুব প্রয়োজন।"

নিজস্ব প্রতিনিধি

পরিতোষবাবুর পাঠকেরা

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

পরিতোষবাবু হঠাৎ করেই বড় ভাবনায় পড়েছেন। বারান্দায় বসে-বসে পাঁচিলে বসে থাকা ছুলো, ইতিউতি ছুটে বেড়ানো কাঠবিড়ালি, ফুটপাথে রঙিন ছাতা মাথায় বসে থাকা পাগলকে দেখছিলেন। কিন্তু না, কিছুতেই তার মনখারাপ দূর হচ্ছিল না।

পরিতোষবাবুর ছোটবেলা থেকে একটাই স্বপ্ন ছিল বড় লেখক হওয়ার।

তাগিদটা যেন ভিতর থেকেই আসত ঠিক ঢেকুরের মতো গুড়গুড় করে। আর খাতার পাতায় একের পর-এক দারুণ সব গল্প লিখে ফেলতেন তিনি। 'দারুণ' অবশ্য পরিতোষবাবুর নিজের কাছেই। কারণ স্রষ্টার কাছে তার সৃষ্টি যে কী মহার্ঘ বস্তু, তা ওই ছাতা মাথায় অনর্গল ছড়া কাটতে থাকা পাগলটাও জানে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই পাগলটার ছড়াও রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজন শোনে, আসলে মজা দেখে, তবু পরিতোষবাবুর গল্প কেউ শুনতেও চায় না, পড়তেও চায় না! সবাই বলে গল্পগুলো বড়ই অদ্ভুত, বড়ই উদ্ভট।

পরিতোষবাবুর ধারণা, আসলে গল্পগুলো যুগের চেয়ে এগিয়ে। যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা কোনও জিনিসকেই সাধারণ জনতা মান্যতা

দেয় না। কিন্তু এই লেখাগুলো প্রকাশিত না হলে যে সাহিত্যের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে, সেই বিষয়ে পরিতোষবাবুর কোনও সন্দেহ নেই।

তবু এক মক্কেলকে তুতিয়েপাতিয়ে যে করেই হোক একটা বই বের করার ব্যবস্থা পরিতোষবাবু করলেন।

সে সম্পর্কে পরিতোষবাবুর বড় জামাইবাবুর মাসতুতো ভাইয়ের শ্যালক। তার চেনা এক প্রকাশককে রাজি করিয়ে, মুখবন্ধ প্রকাশনী থেকে একটা বই বের করলেন। বইয়ের নামে একটা চমক থাকা চাই। তাই অনেক ভেবে বইয়ের নাম দিলেন, 'চমকদার'।

এর মধ্যে বেশ অনেকদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু মুখবন্ধ প্রকাশনীর মুখ যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে!

কোনও সাড়া না পেয়ে পরিতোষবাবু একদিন ফোন করলেন।

"হ্যালো-হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? নমস্কার! আমি পরিতোষ মজুমদার কথা বলছি।"

"পরিতোষ?"

"হ্যাঁ, পরিতোষ মজুমদার। সেই যে মাসছয়েক আগে আমার একটা বই বেরিয়েছিল..."

কিছুক্ষণ ভাবার পর সেই ভদ্রলোক নামটা মনে করতে পারলেন।

"ওহ আচ্ছা, আচ্ছা। সেই যে চমৎকার না চমকদার নামে একটা বই আছে তো আপনার?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আমার বইগুলো কীরকম আছে সেটাই জানতে চাইছিলাম।"

"বইগুলো তো দিব্যি আছে, চমৎকার আছে। শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে গুদামঘরের আলমারির মধ্যে। দিব্যি আরামে। কী বলব মশাই, একটা বইয়েরও বিক্রি নেই! লোকজন আসছে, নাড়াচাড়া করে রেখে দিয়ে যাচ্ছে।"

"আমার মনে হয় বুঝলেন... বইয়ের মলাটটা পালটাতে হবে। ছবিটা ভীষণ বিটকেল।"

"মলাটটা আমার বউয়ের আঁকা," বলে দুম করে ভদ্রলোক ফোনটা কেটে দিলেন।

পরিতোষবাবুর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ওঁর প্রতিভা কেউ চিনল না, জানল না। পৃথিবীতে আসাটাই বৃথা হয়ে গেল।

পরিতোষবাবু একদিন বইয়ের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "পরিতোষ মজুমদারের বই আছে? 'চমকদার' না কী যেন নাম..."

"নেই," ছেলেটা অম্লানবদনে বলে দিল। কী আশ্চর্য! বইটা পিছনের তাকেই একদম শেষের সারিতে শোভা পাচ্ছে! ছেলেটা একটু ভিতরে যেতেই পরিতোষবাবু চটপট গিয়ে বইটা একদম সামনের তাকে সাজিয়ে রাখলেন।

তারপর লোকটাকে বললেন, "এই তো, এই বইটাই চাইছিলাম।"

লোকটা মুখ ভেটকে বলল, "এরকম একটা খাজা বই পাগলেও ছোঁবে না, ছাগলেও না! কেউ নেয় না ওটা।"

বড্ড পাকা ছোকরা। পরিতোষবাবুর বেজায় রাগ হল। বললেন, "আমার ওই বইটাই চাই, বুঝলে? পাঁচ কপি প্যাক করে দাও।"

নিজের বই নিজেই কিনে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

বলে কিনা খাজা বই! পরিতোষবাবু বাড়ি ঢুকতেই যাচ্ছিলেন। দেখলেন রাস্তার পাগলটা হাত নেড়ে ডাকছে। হয়তো ওর খিদেই পেয়েছে। পরিতোষবাবু সামনে যেতেই বলে উঠল, "হিং টিং ছট, ক্রিং কিং খট, আকাশের রং সাদা ফটফট..."

পরিতোষবাবুর কেমন মায়া হল। আহা, ওর ছড়াও তো কেউ শোনে না। সবাই হাসে। কোনও মানে না থাক, ছন্দ তো আছে। হাততালি দিয়ে বললেন, "বাহ, বাহ। বেড়ে হয়েছে।"

পাগলটা কীরকম পুলকিত হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রাহু কেতুর খেলা, বুঝবে সবাই ঠেলা, লক্ষ তারার মেলা, শূন্যে তাদের খেলা।"

তারপর নেচে-নেচে বলতে লাগল, "ঝিনি ঝিনি বাদলায় চিনি চিনি বৃষ্টি, ব্যাঙেদের জটলায়, সাপেদের ফিস্টি।"

শেষ পর্যন্ত পরিতোষবাবুর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে আর একটা পাকা কলা খেয়ে সে শান্ত হল।

দিনদশ পরে হঠাৎ একদিন প্রকাশকের ফোন পেলেন পরিতোষবাবু।

"অভাবনীয় ব্যাপার মশাই! আপনার বই হু-হু করে বিক্রি হচ্ছে। দলে-দলে লোক এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। একদিন একজন এসে একাই একশো কপি কিনে নিয়ে গেলেন। রোজ কেউ না-কেউ এসে আপনার বইয়ের খোঁজ করে যাচ্ছেন।"

পরিতোষবাবু তো আনন্দের চোটে কথাই বলতে পারলেন না। দেরিতে হলেও লোকে তার লেখা চিনেছে। তবে নিজের চোখে না দেখলে ঠিক উপলব্ধি হয় না। তাই পরিতোষবাবু ঠিক করলেন একটা গোটা দিন বইয়ের দোকানেই বসে কাটাবেন।

তাই সকাল-সকাল চলে গেলেন সেখানে। সত্যি-সত্যি এক ঘণ্টা বাদে-বাদেই এক-একজন এসে বইটার খোঁজ করছে। পরিতোষবাবু ভারী অবাক হলেন। কারণ এই লোকগুলোকে দেখে আদৌ ভারতীয় মনে হয় না। কোন দেশি, তাও বোঝা যায় না। গায়ের রং ফ্যাকাসে, কানের উপর দিকটা লম্বা ছুঁচলো।

খুব সুন্দর বাংলা বলতে পারলেও, গায়ে ভারতীয় পোশাক থাকলেও যেন ঠিক এদেশীয় নয়। অবশ্য পরিতোষবাবুর মনের ভুলও হতে পারে। এরকম উদ্ভট চিন্তা করার জন্যই তো ওঁর গল্প সাধারণ লোকে কেউ পড়ত না।

যারা পরিতোষবাবুর বই কিনছে তাদের যে বুদ্ধি এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এই বিষয়ে পরিতোষবাবুর কোনও সন্দেহ নেই।

খটকা একটা বিষয়েই, যেটা পরিতোষবাবু আজ সকাল থেকেই লক্ষ করেছেন।

শীতকাল। সেরকম বৃষ্টি নেই, রোদও নেই। অথচ যারাই পরিতোষবাবুর বই কিনতে এসেছে, সবার হাতেই একটা করে নীলরঙা ছাতা রয়েছে। একেবারে একরকম দেখতে ছাতা।

দিনের শেষে কৌতূহলী হয়ে পরিতোষবাবু এরকমই একজনের পিছু নিলেন।

লোকটা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটে। পরিতোষবাবু আর পেরে উঠছেন না। লোকটা যেন বুঝতে পেরেছে। ট্রামলাইন পেরিয়ে তাই সোজা ময়দানে চলে গেল। তারপর যা দেখলেন পরিতোষবাবু, নিজের চোখকেই বিশ্বাস হয় না। ছাতাটা মাথার উপর ফুটিয়ে বন্ধ করতেই ছাতাসুদ্ধ লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরিতোষবাবু এই কথাগুলো কাউকে বলেননি। আর লেখা বন্ধও করেননি। উনি জানেন যে ওঁর লেখার বিস্তর পাঠক আছে, যারা নীল ছাতা মাথায় দিয়ে আসে।

আর পাগলটাকেও উনি এখন খুব সমীহ করেন। পাগলটার ছাতার রংটাও নীল কিনা!

ছবি: শুভম দে সরকার

পৃথিবী এখন জতুগৃহ

খুব ঘন-ঘন আগুন লাগছে জঙ্গলে। দাবানলে পুড়ে গিয়েছে আমাজন থেকে অস্ট্রেলিয়ার অরণ্য। কেন এত দাবানল? লিখেছেন অচ্যুত দাস

কোয়ালাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়

তথ্য ১ : ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই অস্ট্রেলিয়ায় আগুন জ্বলছে দাউদাউ। দাবানল সেখানে নতুন কোনও ঘটনা না হলেও পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭৪-এর পর আর কখনও এত বিধ্বংসী আগুন সেখানে লাগেনি। যে কোয়ালা সাধারণত জল খায় না, সেই প্রাণীকেও পরিস্থিতির চাপে পড়ে ঢকঢক করে জল খেতে দেখা গিয়েছে।

তথ্য ২ : ২০১৯-এ সারা পৃথিবী জুড়ে সবচেয়ে বেশি হইচই হয়েছে আমাজন বর্ষাঅরণ্যের দাবানল নিয়ে। হবে না-ই বা কেন! ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯-এ সেখানে দাবানলের সংখ্যা বেড়েছে ৭৫%! বাসস্থান বা ব্যবসা বা নিদেনপক্ষে চাষের জমি তৈরির জন্য নির্বিচারে জঙ্গল কেটে সাফ করার পাশাপাশি সারা বিশ্বের মানুষ এই দাবানলের জন্য দায়ী করেছেন ব্রাজিলের সরকার ও তার শীর্ষপদে আসীন, প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোকে।

তথ্য ৩ : রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় দাবানল হয়েই থাকে। কিন্তু ২০১৯-এ সেখানে এমন ভয়ানক দাবানল হয়েছে যে তার জেরে শুধু জুলাই মাসেই বাতাসে মিশেছে ৩০০ মেগাটন কার্বন ডাইঅক্সাইড। সবচেয়ে চিন্তার কথা, সাইবেরিয়ার দাবানলের ফলে তৈরি হওয়া 'ব্ল্যাক কার্বন'-এ ঢেকে গিয়েছে উত্তর মেরুর বরফাবৃত এলাকা। অন্যান্য রংয়ের চেয়ে কালো রং তাপ শুষে নিতে পারে ভাল। ফলে উত্তর মেরুপ্রদেশের ছাইয়ে ঢাকা বরফ বেশি পরিমাণে সূর্যালোক শুষে নিয়ে গলে যাচ্ছে হু হু করে!

তথ্য ৪ : দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায়ও দাবানল প্রতি বছর হয়ে থাকে। কিন্তু ২০১৯-এর শুষ্ক আবহাওয়ার জেরে ইন্দোনেশিয়ায় দূষণ

দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল সারা বিশ্বের। বিশাল এলাকা জুড়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষ বায়ুদূষণের শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলও বন্ধ রাখতে হয় অনেকদিন!

তথ্য ৫ : ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০১৭ ও ২০১৮ সালের দাবানলের চেয়ে ২০১৯-এর দাবানলে কম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ানক ১০টি দাবানলের একটা তালিকা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে ভয়ংকরতম সাতটা দাবানল ঘটেছে মাত্র গত চার বছরে।

তথ্য ৬ : মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবাননেও এবছরের দাবানল ছাপিয়ে গিয়েছে গত কয়েক দশকের রেকর্ড। আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও দাবানলের বিধ্বংসী ক্ষমতাকে সেদেশের সরকার সময়মতো গুরুত্ব দেয়নি বলেই বিপর্যয় আরও বেড়েছে বলে শোনা গিয়েছে বারবার।

তথ্য ৭ : দাবানল হয়তো ভারতে হয়নি। তবে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা প্রায় দাবানলেরই সমতুল্য। সেই ঘটনার খবর আমাদের দেশের টিভিতেই দেখানো হচ্ছিল কয়েক মাস আগে। পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ফসলের গোড়া পোড়ানোর ফলে দূষিত ধোঁয়ায় ঢেকে যায় দেশের রাজধানী দিল্লি। শ্বাসতন্ত্রের জটিল রোগে আক্রান্ত হন বহু মানুষ। পরিবহণ ব্যবস্থা, বিশেষ করে বিমান চলাচল ব্যাহত হয় দীর্ঘদিন। বাধ্য হয়ে বন্ধ রাখতে হয় রাজধানীর স্কুল-কলেজ-অফিস।

কেন এত দাবানল?

মাসের পর-মাস খরার পর অবশেষে ২০১৯-এর শেষে অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে আগুন লেগেছে। পুড়ে ছাই হয়েছে ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটার জমি। মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জন মানুষ এবং অন্তত দশ কোটি প্রাণীর। মাইলের পর-মাইল জুড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মহাদেশের অর্ধেকের বেশি অংশ ঢেকে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায়। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ ফায়ার্স'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ সালে সারা পৃথিবীতে এক বর্গকিলোমিটারের চেয়ে বড় জায়গায় আগুন লেগেছে, এমন ঘটনা ঘটেছে ৪৫ লক্ষেরও বেশি এলাকায়। ২০১৮ সালে এই সংখ্যাটা ছিল অন্তত চার লক্ষ কম। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এক-এক বছরে দাবানলের সংখ্যা বা ভয়াবহতার বাড়া-কমা চলতেই থাকে। কিন্তু এই সংখ্যাটা বেড়ে যাওয়ার পিছনে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে মহাসমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

সমুদ্র আর দাবানল

ক্রমাগত গ্রিন হাউজ় গ্যাস নিঃসরণের ফলে ১৯ শতক থেকে এযাবৎ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস। পিছিয়ে নেই সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও। দূষণের প্রশ্রয় পেয়ে সে বেড়েছে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবার ঘটনা হচ্ছে এই যে, মহাসমুদ্ররা শুধু জল ধরে রাখে, তা তো আর নয়।

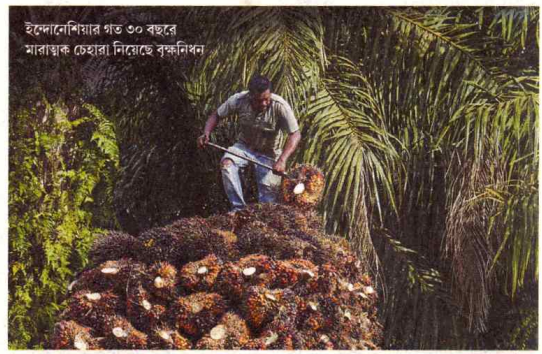
ইন্দোনেশিয়ার গত ৩০ বছরে মারাত্মক চেহারা নিয়েছে বৃক্ষনিধন

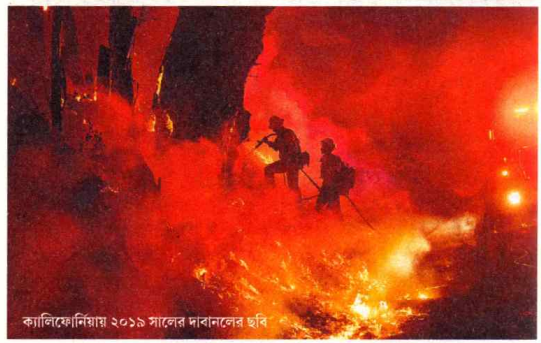
ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০১৯ সালের দাবানলের ছবি

এরা আসলে কাজ করে আমাদের গ্রহের শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র হিসেবে। সহজ ভাষায়, এরা যেন আমাদের গ্রহের এয়ার কন্ডিশনার, যারা সারা পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সেই এ সি যদি নিজেই গরম হয়ে যায়, তা হলে যা হওয়া উচিত, আমাদের সঙ্গে হচ্ছেও তাই।

বরফের গায়ে আগুন

উত্তর আমেরিকার একেবারে উত্তর পশ্চিম কোণে আলাস্কায় গত বছর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এক অভূতপূর্ব রেকর্ড। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তর গোলার্ধের এতটা উত্তরেও তাপমাত্রা এভাবে বাড়তে থাকলে আগামী দিনে সারা উত্তর গোলার্ধ জুড়ে এমন

দাবানল থেকে বাঁচার চেষ্টা ক্যাঙারুর,-অস্ট্রেলিয়ায়

সাইবেরিয়ার জঙ্গলে আগুন

ভয়ানক দাবানল দেখা যেতে পারে, যেমনটা দেখা যায়নি গত ১০,০০০ বছরে। কানাডার উত্তরে অ্যালবার্টায় ২০১৯-এর গ্রীষ্মে ৮,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে শতাধিক দাবানল জ্বলেছে মাসের পর-মাস ধরে। রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় আগুন লেগে মোট যত জঙ্গল পুড়েছে, সেই জায়গায় এঁটে যেতে পারে আস্ত পর্তুগাল দেশটা। আগুন বাড়তে-বাড়তে ছুঁয়ে ফেলেছে এমনকী, উত্তর মেরুকেও! যে ঘটনাও এর আগে কখনও হয়েছে বলে জানা নেই।

দায় কার?

দাবানলের খবর শুনে অনেকেই বিশেষ পাত্তা না দিয়ে ঘাড় নেড়ে বলে দেন, "ও তো হবেই। প্রাকৃতিক ব্যাপার। পুরনো জঙ্গলে আগুন লেগে সব ছাই হলে তবেই না নতুন ঘাসপাতা, গাছপালা জন্মাবে!"

কিন্তু সত্যিটা এই যে, ইদানীং সারা পৃথিবীতে যত দাবানল হচ্ছে, তার ৯৬%-এর জন্যই সরাসরি দায়ী মানুষ। বাজ পড়ে বা গাছের শুকনো ডালপাতায় ঘষা লেগে দাবানলের ঘটনা ঘটছে মাত্র ৪%! ইন্দোনেশিয়ায় যেমন, ১৯৯০ সাল থেকে গত তিরিশ বছরে কাগজ আর তেল বানানোর জন্য কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ বর্গকিলোমিটার জঙ্গল। আফ্রিকা মহাদেশে দাবানলের জন্য দায়ী করা হচ্ছে সেখানকার ক্রমাগত বাড়তে থাকা জনসংখ্যাকে, যাঁরা দ্রুত হারে ধ্বংস করে চলেছেন প্রাকৃতিক সম্পদ। জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য আমাদের দেশের কৃষকরা ফসল তোলার পর মাঠে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন, সে ঘটনা তো আগেই বলেছি। পৃথিবীর বহু দেশে এই প্রচলন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলেও অনেক দেশেই এখনও কৃষকরা সচেতনতার অভাবে এই কাজ করে যাচ্ছেন। আমাজনের অরণ্যে আগুন লাগানোর পিছনেও মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল বলে জানা গিয়েছে। ৩০ বছর আগেও যে বৃষ্টিভেজা আমাজনে আগুন ধরা যথেষ্ট কঠিন ছিল, আজ শুকনো আবহাওয়ার জেরে সেখানেই মাসের পর-মাস কালো ধোঁয়ায় মুখ ঢেকেছে আকাশ।

তা হলে উপায়?

পৃথিবীর অন্যতম শীতলতম এলাকা সাইবেরিয়ায় আগুন লেগেছে। জ্বলেপুড়ে অনেকটাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই গ্রহের অন্যতম আর্দ্রতম জঙ্গল আমাজন। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ সাধারণত এক বছরে যতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে থাকে, তার অর্ধেক সে তৈরি করেছে গত চার মাসের দাবানলে। চিন্তার বিষয় এই যে, দাবানলের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণও পাল্লা দিয়ে বাড়বে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাও বাড়তেই থাকবে। যার জেরে ক্রমশ আরও শুকনো হবে জঙ্গল, আগামী দাবানল লাগবে আরও সহজে।

অর্থাৎ ইতিমধ্যেই আমরা যা করে বসেছি, তার জেরে ভবিষ্যতে আরও বিধ্বংসী সব দাবানল লাগার ক্ষেত্র তৈরি হয়েই আছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বেশি-বেশি করে গাছ লাগিয়ে, স্থল, জল, বায়ু, শব্দ ইত্যাদি বিবিধ দূষণ কমিয়ে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি কমানো না যায়, তা হলে রক্ষে নেই। আজ দাবানলে পুড়ে মরছি, কাল বাদে পরশু সেগুলোর জেরে বরফ গলে সমুদ্রের জল বাড়লে সেই জলে ডুবে

দাবানলের মুখে পড়ে জল খাচ্ছে কোয়ালা

মরতে হবে কোটি-কোটি প্রাণীকে। মনে রাখতে হবে, এরকম একটা ভয়ানক সময়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশরক্ষার কাজটা সহজ নয়, কারণ সারা গ্রহের সবাই এতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ না নিলে এই সমস্যার মুখোমুখি হওয়াই যাবে না, সমাধান দূর অস্ত!

আমার ইচ্ছেমতো

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি

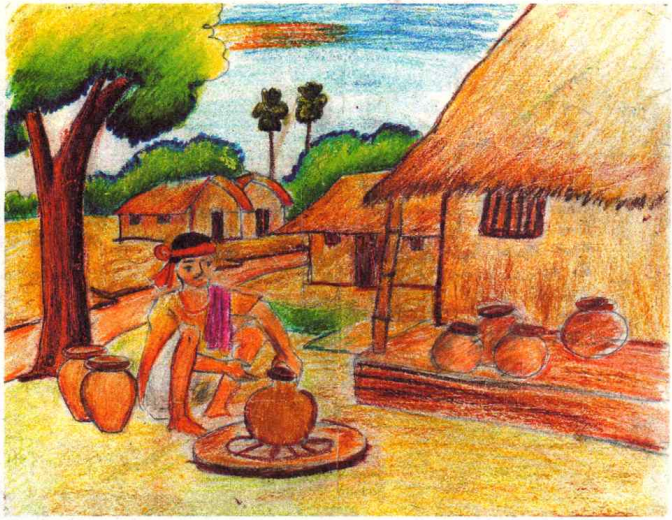

মোহর দণ্ডপাট
অষ্টম শ্রেণি, মিশন গার্লস হাই স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

সুরঞ্জিতা মণ্ডল
অষ্টম শ্রেণি, ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাই স্কুল, কলকাতা।

আমার ছবি

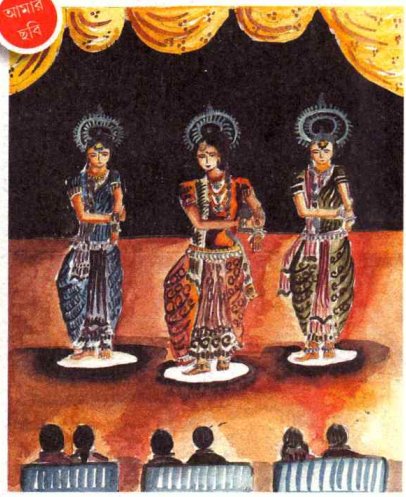

আমার লেখা

যে করে বায়না সে খেলে আয়না

একটি মায়ের মেয়ে ছিল
নাম রাখেন ময়না
মাকে দেখে ময়না
করত খালি বায়না
বায়না শুনে মা রেগে
বলত তোকে চাই না।
মায়ের কথা শুনে ময়না
করত না আর বায়না।
মা বলত, এই তো আমার
একমাত্র ময়না
হঠাৎ একদিন ময়না
কেঁদে করে বায়না
মা এসে মুখে ধরে আয়না
ময়না সেই আয়না দেখে
করত না আর বায়না।

অহনা দাস
সপ্তম শ্রেণি, তেলিনিপাড়া ভদ্রেশ্বর গার্লস হাই স্কুল, হুগলি।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও।

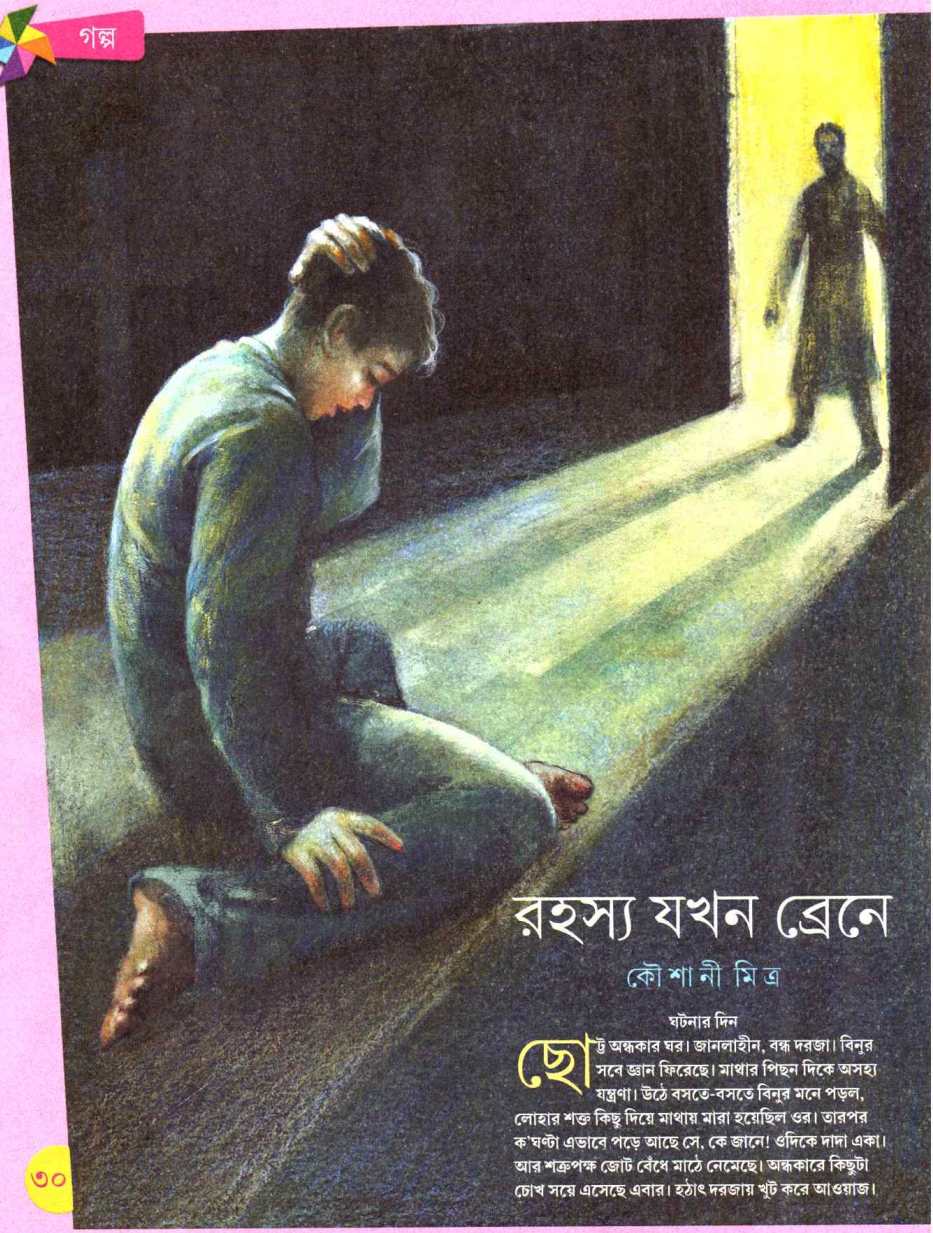

রহস্য যখন ব্রেনে

কৌশানী মিত্র

ঘটনার দিন

ছোট্ট অন্ধকার ঘর। জানলাহীন, বন্ধ দরজা। বিনুর সবে জ্ঞান ফিরেছে। মাথার পিছন দিকে অসহ্য যন্ত্রণা। উঠে বসতে-বসতে বিনুর মনে পড়ল, লোহার শক্ত কিছু দিয়ে মাথায় মারা হয়েছিল ওর। তারপর ক'ঘণ্টা এভাবে পড়ে আছে সে, কে জানে! ওদিকে দাদা একা। আর শত্রুপক্ষ জোট বেঁধে মাঠে নেমেছে। অন্ধকারে কিছুটা চোখ সয়ে এসেছে এবার। হঠাৎ দরজায় খুট করে আওয়াজ।

কেউ আসছে। বিনু তাকাল দরজার দিকে। যিনি ঢুকলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল বিনু।

ডায়না আর শ্যামের গল্প
প্রথম পর্ব

গল্পের শুরু আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। শ্যাম তখন কলেজে। তাঁর প্রিয় স্যার স্যামুয়েল বেকম্যান তাঁকে শেখাচ্ছেন 'ব্রেন ওয়েভ' কী? পড়ার ফাঁকে খেলছেন মাইন্ড গেম। শ্যামকে বুঝতে হবে, শিখতে হবে, আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করে ভাবতে হবে। স্যামুয়েলের মেয়ে ডায়না ফ্রেঞ্চ শিখছে ইউনিভার্সিটিতে। শ্যামকে নিজের ছেলের মতো দেখা প্রোফেসরের ইচ্ছেয় চার হাত এক হতে বেশি সময় লাগল না। ডায়নার কাছ থেকে শ্যাম শুনেছিলেন, জন্মসূত্রে ওরা ওলন্দাজ। অবসর নেওয়ার পর স্যামুয়েল ফিরে গেলেন রটারডামে। সেখানে অপেক্ষা করছে স্যামুয়েলের মাতৃহারা ছেলে পিটার। আর শ্যাম-ডায়না থেকে গেলেন নিউ ইয়র্কে। শ্যাম তখন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর। সঙ্গে চলছে তাঁর নিজস্ব গবেষণার কাজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে একদিন দেখা হয় ছেলেটির সঙ্গে। তুখড়, মৃদুভাষী এবং বুদ্ধিমান। তারপর প্রায়ই ছেলেটি আসত তার বাড়ি। জানত বিজ্ঞানের অজানা বিষয়। শ্যাম জেনেছিলেন ছেলেটি ভারতীয় বাঙালি, নাম জিশান রায়চৌধুরী। ওই একটা দেশ, অনেকদিন আগেই যার স্মৃতি মুছে গিয়েছে শ্যামের জীবন থেকে।

ঘটনার ঠিক দশ দিন আগে

"চল, একটা দেশ দেখা তো হবে," ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল জিশান।

"আর তুই তো একাই একশো, এবারেও যদি বিপদে পড়ি..."

মউ টুবাইয়ের হোমওয়ার্ক দেখে দিচ্ছিল। আঁতকে উঠল, "এই তো সেদিন ইউনিভার্সিটি জয়েন করলে, আবার এখনই ঝামেলায় না গেলে হচ্ছিল না?"

টুবাই নিশ্চিন্তে পেনসিল চিবোচ্ছিল এতক্ষণ। মায়ের হাতের কানমলা খেতে-খেতে ও শুনল বাবা বলছে, "মউ প্লিজ, স্যারের খুব বিপদ। আমাকে ইমেল করেছেন। জলদি যেতে বলেছেন। ওঁর গবেষণা নিয়েও কিছু বলবেন। সাফল্য পেয়েছেন মনে হল। আমার মন বলছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।"

"কিন্তু, মানে... আমি তো উচ্চ মাধ্যমিকটাই..."

"তাতে কী? তুই আগের বার 'হেপ্টোপেনের হাতি' নিয়ে যা বলেছিলি, হলভর্তি লোকের সামনে ওইটুকু আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট। আর তা ছাড়া আমরা তো কোনও সেমিনারে যাচ্ছি না। যাচ্ছি একটা অদ্ভুত জিনিস চাক্ষুষ করতে," জিশান চিন্তিত মুখে তাকাল বইয়ের আলমারির দিকে।

ডায়না আর শ্যামের গল্প
দ্বিতীয় পর্ব

শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার যখন কলকাতা থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন, সে এক ঐতিহাসিক সময়। কলকাতায় তখন তুমুল গোলমাল। শ্যামের বন্ধুদের কেউ-কেউ মৃত আর কেউ কয়েদখানায়। শ্যাম ছিলেন মেধাবী আর বুদ্ধিমান এবং বন্ধুদের অন্যতম পরামর্শদাতাও বটে। খবর ছড়াতে বেশিদিন লাগল না। আজও সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে শ্যামের গায়ে কাঁটা দেয়। বিপদ এড়িয়ে কীভাবে তিনি আমেরিকা পালিয়ে এসেছিলেন, তা এখনকার বাচ্চাদের কাছে রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার। তারপর আর কোনওদিন বাংলায় ফেরা হয়নি।

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যার পিছনে ছুটছিলেন তিনি, আজ তাতে সফল হয়েছেন। নিজের স্ত্রী ডায়নাই ছিল প্রথম পরীক্ষার্থী। আর তারপর থেকেই মাথার ভিতর হাজারটা বোমা একসঙ্গে ফাটছে। এক দশক আগের কিছু ঘটনা চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। শ্যামের সহকারী নিকোস এরাসমাস ইউনিভার্সিটিতে 'ব্রেন ওয়েভ রিদ্‌ম' নিয়ে গবেষণা করছে। সঙ্গে স্যারের কাছে পার্টটাইম কাজ করে সে। সবটা সামনে থেকে দেখে বুঝে সে-ও হতভম্ব।

"আচ্ছা স্যার, এ তো ইচ্ছে করলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধানো যায়, আবার অপরাধীদের সব ভাবনা ট্র্যাক করে, দেশকে অপরাধীহীন করে দেওয়া যায়!" নিকোস ভয়ে-ভয়ে বলল।

"হ্যাঁ, আরও অনেক কিছুই করা যায়। আর তাই জিশানকে ডেকেছি ইন্ডিয়া থেকে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কার আমি পাঠাব ভারতবর্ষে। আমার দেশ আর পিছিয়ে থাকবে না নিকোস। আমরাও এবার তোমাদের মতো এগিয়ে যাব।"

ঠিক একদিন পরের কথা। মেশিন আপগ্রেডেশনের কাজে ব্যস্ত শ্যাম। নিকোস ছুটি নিয়েছে আজ। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ।

"কে?" পিছনে ফিরতে গিয়েও পারল না শ্যাম। মাথায় লোহার রডের আঘাতে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

ঘটনার ঠিক তিনদিন আগে

"দাদা, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ল্যান্ড করব, এবার তো পুরোটা বল প্লিজ," বিনু কাঁদো-কাঁদো।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছবে আমস্টারডাম। শেষ দু'দিন স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। শুধু

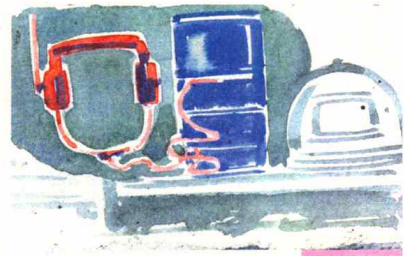

ঠিকানাটুকুই সম্বল। চিন্তিত জিশান বলল, "শ্যামাপ্রসাদ মজুমদারের সঙ্গে আমার আলাপ আমেরিকায়। উনি ছিলেন সায়েন্টিস্ট-প্রোফেসর। ওঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'মাইন্ড রিডিং'। প্রত্যেক মানুষ অনর্গল কিছু না-কিছু ভেবে চলে। ব্রেন ওয়েভকে রিদ্‌মে কনভার্ট করে সে কী ভাবছে, সেটা বলে দেওয়া সম্ভব।"

"সত্যি?" বিনু অবাক।

"হ্যাঁ, সাইকোলজিস্টরা যেমন মানুষের ব্যবহার দেখে বলে দিতে পারেন, বিজ্ঞান আর-একধাপ এগিয়ে ভেবেছে। ধর যারা কথা বলতে পারে

না, তাদের ভাবনা, চিন্তা এখানে ধরা পড়বে।"

"আচ্ছা দাদা, উলটোটাও তো হতে পারে। কেউ কিছু গোপন করতে চায় আর 'মাইন্ড রিডিং'-এর মাধ্যমে সেটা বুঝে গেলাম। তা হলে তো সর্বনাশ! দেশের নিরাপত্তামস্ত্রক থেকে শুরু করে বড়-বড় অপরাধী, সবাই চাইবে এই যন্ত্র।"

"স্যার নিজেও বিপদের আঁচ পেয়েছেন। আমাকে তার আভাস দিয়েছেন ইমেলে।"

ডায়না আর শ্যামের গল্প
তৃতীয় পর্ব

বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। রাতের দিকে ফোন এল, স্যামুয়েলস্যার অসুস্থ। মেয়ে ডায়নাকে যেতে হবে রটারডাম। শ্যামের সেমিনার আর ক্লাস থাকায় ডায়না রওনা দিল। চার-পাঁচদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ডায়নার বাবা মারা গেলেন। সব কাজ মিটিয়ে ডায়নার ফিরে আসার কথা, কিন্তু তার মধ্যেই ঘটল বিপদ। ভয়ংকর দুর্ঘটনা। সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ডায়না খালি চোখের জলটুকু ফেলতে পারতেন। অসহায় শ্যাম আমেরিকার পাট গুটিয়ে চলে এলেন নেদারল্যান্ডস। কাজ শুরু করলেন শ্বশুরমশাইয়ের ল্যাবে। ডায়নার ভাই পিটার জানাল, বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর জন্য দিদির এই হাল। শ্যাম অবাক। ডায়না আর বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো! কোথাও যেন একটা সুতো কেটে যাচ্ছে!

কী ঘটেছিল ডায়নার সঙ্গে সেদিন? শ্যাম মন দিলেন তাঁর কাজে, মাইন্ড রিডিং মেশিন তাঁকে বানাতেই হবে, ডায়নার ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হলেন তিনি।

ঘটনার ঠিক দু'দিন আগে

আমস্টারডামে রাত কাটিয়ে জিশান আর বিনু যখন রটারডামে স্যারের বাড়ি পৌঁছল, তখন অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। স্যার, ডায়নাম্যাম কেউই আর বেঁচে নেই। জিশানদের রটারডাম সিটি থেকে নিতে এল নিকোস, স্যারের সহকারী। কে বা কারা যেন স্যারকে মেরে ল্যাব থেকে কিছু নথি আর মাইন্ড রিডিং মেশিন চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। জিশানের ঠোঁট শক্ত হল। আফসোসের সময় নেই এখন আর, "বিনু তৈরি হ, আমরা বিপদের খুব কাছেই আছি।"

স্যামুয়েল বেকম্যানের বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে চাষবাস করে স্যামুয়েলের ছেলে পিটার। চল্লিশের

বেডরুম লাগোয়া ছোট্ট একটা স্টাডি কাম ওয়ার্কশপ, সেখানে সাবধানে টেবিল হাতড়াচ্ছে বিনু। যদি কিছু পাওয়া যায়। দাদা গেস্টরুমে আর পিটার পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে। এদের মধ্যে একজন কেউ জানতে পারলে বিনু শেষ।

কাছাকাছি বয়স তার। বাড়ির একদিকে ছোট্ট একটা ফার্মহাউজ আছে, সেখানেই থাকে সে। চুপচাপ স্বভাবের পিটার জিশানদের দেখে এগিয়ে এল। দিদি আর জামাইবাবুর কাজ ও-ই করেছে। তাই বেশ ক্লান্ত। নিকোস জানাল জিশানরা যখন এসেই গিয়েছেন, তখন গেস্টরুমে যেন বিশ্রাম নিয়ে নেন। তারপর যদি কিছু জানার থাকে, তা হলে নিকোস সাহায্য করবে।

বিনু লক্ষ করল, স্যারের মৃত্যুতে নিকোস একেবারে ভেঙে পড়েছে। জিশান তাকে আশ্বাস দিল, "বিশ্রাম নিতে আমরা আসিনি নিকোস। স্যার আমাকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। স্যার আজ নেই, তুমি আছ। তোমাকেই সবটা বলতে হবে। আমরা একটু কথা বলতে পারি?"

নিকোস জিশানের দিকে তাকাল, "হ্যাঁ স্যার, চলুন।"

"সেদিন রাতে আমি বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম। বোনের জন্মদিন ছিল। আর পরদিন সকালে এই কাণ্ড। স্যার আর মেশিন, কোনওটাই নেই। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করছে। তবে আমি জানি, স্যার তাঁর গবেষণায় সফল হয়েছিলেন। আর তার প্রথম পরীক্ষা তিনি করেন ডায়নাম্যামের উপর। সেসময় আমি ঘরে ছিলাম না। আমাকে স্যার থাকতে দেননি। যদিও পরীক্ষা শেষে ঘরে গিয়ে দেখি স্যার চেয়ারে বসে, ঘামছেন খুব। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

বিনু বিড়বিড় করল, "অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?"

ঘরের এটা-সেটা দেখতে-দেখতে জানলার কাছে গেল সে। বাইরে বিস্তীর্ণ মাঠ আর তারপর উঁচু টিলা। সত্যি জায়গাটা খুব সুন্দর। কিন্তু ওখানে কে? মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে পিটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গেস্টরুমের দিকে তাকিয়ে আছে। বিনুর কানে এল জিশান নিকোসকে বলছে, "এখানকার স্থানীয় পুলিশের নম্বরটা প্লিজ।"

ঘটনার ঠিক একদিন আগে

বিনু যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলেছে। সকালে দাদা স্থানীয় পুলিশ এবং গির্জার ফাদারের সঙ্গে দেখা করেছে। নেদারল্যান্ডসের এই শহরে ক্যাথলিক গির্জার খুব আধিপত্য। সবার খবর জমা থাকে এই ধর্মীয় স্থানটিতে। গির্জার ফাদার র‍্যাভেনক্লু মিষ্টভাষী। জানিয়েছেন শ্যাম খুব ভালমানুষ ছিলেন, ডায়নাকে নিয়ে প্রতি শুক্রবার এসে প্রার্থনা করতেন।

এসবের মধ্যেও বিনুর মন থেকে যাচ্ছিল না, জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পিটারের সেই দৃষ্টি। এখন বিনু পিটারের ঘরে। বেডরুমলাগোয়া ছোট্ট একটা স্টাডি কাম ওয়ার্কশপ, সেখানে সাবধানে টেবিল হাতড়াচ্ছে বিনু। যদি কিছু পাওয়া যায়। দাদা গেস্টরুমে আর পিটার পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছে। এদের মধ্যে একজন কেউ জানতে পারলে বিনু শেষ। কিন্তু তাও...

ওটা কী? একটা উইল। বিনু চোখ বোলাল। উইলটা পড়তে-পড়তে বিনুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। গল্প তা হলে এই?

"এই যে মিঃ বিষাণ রায়চৌধুরী, লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘরের ভিতর দস্যিগিরি চলছে? চলে এসো আমার কাছে। এসো-এসো।"

বিনু দেখল একজন সাদা শার্ট আর কালো প্যান্টপরা লোক তাকে ডাকছে। বিনু এগিয়ে গেল।

ঘটনার দিন

অন্ধকারে কিছুটা চোখ সয়ে এসেছে বিনুর। হঠাৎ দরজায় খুট করে আওয়াজ। কেউ আসছে। বিনু তাকাল দরজার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে এসে যে ঢুকল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনু চমকে উঠল।

"বিচ্ছু একটা, সবাইকে টেক্কা দিতে চাস? মেশিনটা এখন আমার কাছে, আর ওটা এদেশেই থাকছে," হিসহিসিয়ে বলল পিটার।

বিনুকে সকাল থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তিত জিশান সিগারেট ধরিয়ে বসে আছে একটা চেয়ারে, তার উলটোদিকের চেয়ারে নিকোস। সামনাসামনি। কেউ কোনও কথা বলছে না। চারদিক নিঃশব্দ। নিকোস শুধু ছটফট করছে। জিশানের চোখে চোখ রাখতে পারছে না সে। জিশান তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"বলে ফেলো নিকোস, আমার ভাই কোথায়?"

"আমি জানি না।"

"ভাবো।"

"জানি না।"

"তুমি জান।"

"মানে... মানে..."

জিশানের মুখে আলগা হাসির রেখা। "নিকোস, তোমার স্যার যখন মাইন্ড রিডিং মেশিন আবিষ্কার করেননি, তখনও মানুষের মাইন্ড রিড করা সম্ভব ছিল সেটা জান তো? মানুষের ব্যবহার দেখে বলে দেওয়া যায় সে কিছু লুকোচ্ছে কি না! আমি বিজ্ঞানী হতে পারি নিকোস, কিন্তু বিহেভিয়ারাল সাইকোলজি নিয়ে আমার চর্চা আছে। আর তোমাকে দেখে আমার সিক্সথ সেন্স বলছে তুমি জান, বিনু কোথায় আছে। সহজে বলবে? নাকি..."

নিকোস কেঁদে ফেলে, "স্যার, আমার কোনও দোষ নেই, প্লিজ় স্যার!"

জিশান উঠে দাঁড়ায়, "আর একে বলে নার্ভের উপর চাপ দিয়ে কথা বের করা। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। স্থানীয় পুলিশ বাইরে অপেক্ষা করছে।"

গির্জার পিছনে ছোট স্টোররুম। তার ভিতর আরও একটা ঘর, সেখানে পাওয়া গেল বিনুকে। পুলিশের তৎপরতা ছিল দেখার মতো। নিকোসের কথামতো মাইন্ড রিডিং মেশিন চুরি করে পিটার নিজেই। তাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিল নিকোস। নিকোসের ইচ্ছে ছিল এই মেশিন যাতে তাঁদের দেশেই থাকে! মেশিন যাঁর হাতে তৈরি, সেই বিজ্ঞানীর পরিচয় বা মেশিনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর কোনও ইচ্ছেকেই নিকোস আদৌ আমল দিতে চায়নি। তার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল যেনতেন প্রকারেণ এই মেশিন এদেশেই রেখে দেওয়া।

কিন্তু তা বলে খুন!

হাঁফাতে-হাঁফাতে বিনু বলে উঠল, "বাকিটা আমি বলছি দাদা। স্যারের খুনি অন্য একজন। খুনের কারণও আলাদা। এর পিছনে লুকিয়ে আছে দীর্ঘ কুড়ি বছর আগের এক ঘটনা।"

ডায়না, পিটার আর শ্যামের গল্প

ডায়নার ব্রেন ভাইব্রেশন কোড ফুটে উঠছে হাইটেক কম্পিউটারে। আর শ্যাম ডি-কোড করে চলেছেন।

বছরকুড়ির পিটার বাজে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছিল। বাবা অনেক চেষ্টা করেও তাকে ঠিক পথে আনতে পারেননি। হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর তাই সম্পত্তি ডায়নার নামে উইল করে যান, সঙ্গে পিটারের মাসিক খোরপোশ। পিটার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। ডায়নার দুর্ঘটনা পিটারের সাজানো। সঙ্গে উইলের বিষয়টাই চেপে গিয়েছে সে। বিশাল সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু বাধ সাধল শ্যামের মাইন্ড রিডিং মেশিন। নিকোসের কাছ থেকে সে জানতে পেরেছিল তারা এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করছে যা দিয়ে সব সত্যি ভাবনা জেনে নেওয়া যাবে। হলও ঠিক তাই, সেদিন সকালে দিদির কাছ থেকে সবটুকু শুনে রাতে খাওয়ার সময় শ্যাম জানাল সে পুলিশে যাবে। পিটার আর ঝুঁকি নেয়নি। সেদিন রাতেই...

বিনুর পিঠ চাপড়ে জিশান বলল, "বুঝলি কীভাবে?"

বিনু হাসল, "স্যারের ল্যাবের ডাস্টবিনে এখনও সেই ডি-কোডিংয়ের টুকরো কাগজটা পাবে। কাগজ দেখেই সন্দেহ হয়, কিন্তু আরও জোরালো প্রমাণ পেতে অপেক্ষা করতে হয় রাত পর্যন্ত। উইলের কপি দেখে বাকিটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। যে লোহার রড দিয়ে স্যারকে মারা হয়েছে, সেটা মনে হয় চাষের জমিতেই পুঁতে রাখা আছে। আর হ্যাঁ, আমাকে কিডন্যাপ করার প্ল্যানটা পিটারেরই ছিল। দায়িত্বটা নিয়েছিল নিকোস। একটু ভয় দেখিয়েই ছেড়ে দিত মনে হয়। মাঝখান থেকে নিকোস যে এমন একটা ভুল করবে, তা পিটার কল্পনাও করতে পারেনি।"

ঘটনার ঠিক পরের দিন

ফ্লাইটে জানলার ধারের সিটটা বিনুর জন্যই বরাদ্দ। পাশের সিটে জিশান বইয়ে মগ্ন। বিনু তাকাল দাদার দিকে, "আচ্ছা দাদা, ওই মেশিনটার কী হবে?"

"এখনও অনেক কাজ বাকি রে। আমি সব ডেটাবেস স্ক্যান করে নিয়েছি। কলকাতায় কাজ শুরু করব। স্যারেরও তাই ইচ্ছে ছিল। উনি যখন বাংলা ছেড়ে গিয়েছিলেন তখন দেশকে কিছু দিয়ে যেতে পারেননি। বন্ধুদের মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে উড়ান ধরেছিলেন। স্যার ভোলেননি তাঁর দেশের কথা। ভারতবর্ষ থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে এক বিজ্ঞানী নিবিষ্ট মনে গবেষণা করে গিয়েছেন দিন-রাত।"

বিনু জানে, তার দাদা নিজেকে ভারতীয় বলতে ভালবাসে আর তাই শ্যামাপ্রসাদ মজুমদারের প্রথম ইমেলটা জিশানের কাছেই এসেছিল। তার দাদা শ্যামস্যারের গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাবে। জানলার বাইরে তাকায় বিনু, ওই তো দেখা যাচ্ছে হাজার-হাজার আলোর চুমকি, ভারতের মাটিতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পা রাখবে তারা।

ছবি: সৌমেন দাস

আমার স্কুলের খুদে প্রতিভা

আনন্দমেলা নিয়ে এসেছে এক অভিনব প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় তোমরা লিখে এবং এঁকে পাঠাতে পারবে। সেরা প্রতিভাদের জন্য থাকবে আকর্ষক পুরস্কার। তবে পত্রিকার পাতায় যে 'খুদে প্রতিভা' বিভাগ, তার সঙ্গে এই বিভাগের সামান্য ফারাক রয়েছে। এক্ষেত্রে নিজের লেখা, আঁকা সরাসরি পত্রিকা দফতরে পাঠাতে হবে না। জমা দিতে হবে স্কুলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে। এখানে লেখা বলতে কোনও গল্প, কবিতা, ছড়া, নিবন্ধ, স্মৃতিচারণ সবই লেখা যাবে। শব্দ সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০। এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় হল, 'পিকনিক'। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়ম:

ক) একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী মাত্র একটাই লেখা কিংবা ছবি পাঠাতে পারবে। একাধিক লেখা, ছবি কিংবা একটা লেখার সঙ্গে একটা ছবি পাঠালে সেটা মনোনীত হবে না।

খ) লেখা, ছবি যদি স্কুলে জমা না দিয়ে সরাসরি পত্রিকা দফতরে পাঠানো হয়, তা হলে সেটা অমনোনীত হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) এই পাতার নীচে যে অংশটি রয়েছে সেটায় নাম, স্কুলের নাম ইত্যাদি লিখে, কেটে নিয়ে তোমার লেখা কিংবা ছবির সঙ্গে অবশ্যই জমা দিয়ো।

নাম: .....

ক্লাস: ..... সেকশন: ..... রোল নম্বর: .....

যোগাযোগের নম্বর: .....

স্কুলের নাম: .....

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

দীপসুন্দর দিন্দা

আমার কুইজ়

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন 'দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স'-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যাঁর নামে, সেই নীলরতন সরকারের ভাই ছিলেন এক বিখ্যাত ছড়াকার, যিনি ছোটদের জন্য অনেক মজার ছড়া লিখেছেন। তাঁর নাম কী?

2 চিন্তামণি, নীলকণ্ঠ, সতীপতি, ত্রিপুরারি, শূলপাণি নামে কোন দেবতা পরিচিত?

8 মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতায় প্রাপ্ত 'ডান্সিং গার্ল' বা 'নৃত্যরত যুবতী' সুপ্রাচীন এক শিল্পের অন্যতম উদাহরণ। আমাদের রাজ্যে বাঁকুড়া ও বর্ধমানের কিছু জায়গা এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। কোন শিল্পের কথা বলা হচ্ছে?

9 কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজ যাঁর নামে, সেই যোগমায়া দেবীর স্বামীও এক বিখ্যাত বাঙালি। কী তাঁর নাম?

3 মনে করা হয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের অবনতি হওয়ায় ধর্মপাল বিহারে অনুরূপ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর নাম কী?

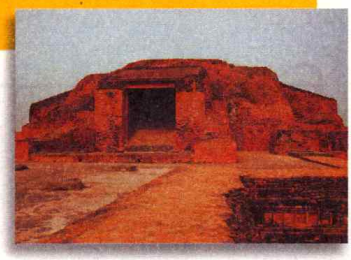

4 ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে বিশ্বের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সানা মারিন। তিনি কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী?

5 সব ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গত দশকে সবচেয়ে বেশি উইকেট (৫৬৪টি) সংগ্রহ করলেন কোন ভারতীয় বোলার?

6 পোলিও রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিলেন কোন মার্কিন বিজ্ঞানী?

7 'ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স' নামের এই ভারতীয় উদ্যান একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এটি কোন রাজ্যে অবস্থিত?

10 আমাদের দেশের বার্ষিক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৫৩ সাল থেকে। ১৯৬৭ সালে এই পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠানে প্রথমবারের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলেন আমাদের সবার চেনা এক বাঙালি অভিনেতা। কে তিনি?

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

১। পাগলা দাশু।
২। পণ্ডিত বংশীধর শুক্ল।
৩। অঞ্জলি চাঁদ।
৪। সংস্কৃত।
৫। মহারানা প্রতাপ সিংহ।
৬। ওড়িশা।
৭। ভিনিগার বা অ্যাসিটিক অ্যাসিড।
৮। কাত্যায়নী।
৯। তুলাইপাঞ্জি চাল।
১০। গ্রিক রাজা আলেকজ়ান্ডারের সেনাপতি।

সঠিক উত্তরদাতা

অনুষা মণ্ডল, *সপ্তম শ্রেণি, লা মার্টিনিয়ার ফর গার্লস, কলকাতা।* **কল্লন দে,** *পঞ্চম শ্রেণি,* **সৌহার্দ্য দাস,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, পাঠভবন, ডানকুনি।* **সোহম সৎপথী,** *অষ্টম শ্রেণি, সিমলাপাল মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।* **ইমন পড়িয়া,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, পাঁশকুড়া বি বি হাই স্কুল, পূঃ মেদিনীপুর।* **গৌরব দে,** *সপ্তম শ্রেণি,* **অর্ক পাল,** *অষ্টম শ্রেণি, নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়, নদিয়া।* **স্বস্তিক মজুমদার,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর।* **অগ্নিমিত্র রায়,** *সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন (উঃ মাঃ), পঃ মেদিনীপুর।* **পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়,** *অষ্টম শ্রেণি, মাড়িনোন নব বিদ্যালয়, গুড়াপ, হুগলি।*

উত্তর পাঠাও ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। আমাদের ঠিকানা 'আনন্দমেলা আমার কুইজ়' বিভাগ।
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।

মিশন ব্রহ্মনাদ

কৃ ষ্ণে ন্দু মু খো পা ধ্যা য়

*(**আগে যা ঘটেছে:** ফাদার ফ্রেডরিকের ডাকে ঈশান আর ঋজুল স্কুলে এলে ফাদার তাদের কাঠের পুতুলের কথা জানান। ওদিকে বাবাজি ঋষিরাজের নির্দেশে ক্যাপ্টেন গড়াই, বিল্লা আর গুড্ডুও 'ব্রহ্মানন্দ' নামের সেই পুতুল চুরি করতে এলাকায় হাজির হয়। নিজেদের কোডনেম তারা রাখে যথাক্রমে ক্যাপ্টেন কুল, কম্যান্ডো আলফা আর কম্যান্ডো বিটা। জানা যায়, বিল্লা চটপট ছদ্মবেশ নিতে আর গুড্ডু লাফঝাঁপে পারদর্শী। ফাদারের ইচ্ছে, পুতুলচোর ধরতে ফাঁদ পাতবেন। ঈশানের কাজ রোবোটিক্স নিয়ে। ঋজুল অন্যের গলা দারুণ নকল করে। তারপর...)*

ঈশান বলল, "ওষ্ঠবর্গীয় ধ্বনি মানে?"

ঋজুল অভিযোগ করে উঠল, "দেখেছেন ফাদার, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে-করতে আমাদের ব্যাকরণটাই ভুলে গিয়েছে! আরে ভাই, বীথিম্যাম শিখিয়েছিলেন, মনে নেই? ক, চ, ট, ত, প বর্গের বর্ণ। তার মধ্যে প বর্গ হচ্ছে ওষ্ঠবর্গীয়।"

ফাদার বললেন, "ঠিক মনে রেখেছ। কণ্ঠ-ধ্বনি, তালব্য-ধ্বনি, মূর্ধণ্য-ধ্বনি, দন্ত্য-ধ্বনি, ওষ্ঠ-ধ্বনি। কোনও ধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত, টাকরা, জিভ, ঠোঁট ব্যবহার করতে হয়। ওষ্ঠধ্বনি হচ্ছে প, ফ, ব, ভ, ম। এইগুলো ঠোঁট বাদ দিয়ে অন্যভাবে উচ্চারণ করতে গেলে একটু খ্যানখ্যানে শোনায়।"

ঋজুল মাথা ঝাঁকাল, "তাই খেয়াল করলি কি, ফাদার যখন 'লেট দেয়ার বি লাইট' বললেন, তখন 'বি'-টা একটু অন্য রকম খ্যানখ্যানে শোনাল?"

ফাদার খুব খুশি হয়ে বললেন, "বাহ! ঠিক খেয়াল করেছ দেখছি। ইংরেজিতে ওষ্ঠ-ধ্বনি অক্ষরগুলো হল পি, এফ, বি, ভি, এম। এগুলোকে ল্যাবিয়াল সাউন্ড বলে। ভেনট্রিলোকুইজ়ম করতে গেলে শব্দের মধ্যে এই অ্যালফাবেটগুলো অন্য অ্যালফাবেট দিয়ে রিপ্লেস করতে হয়।"

ঈশান হাততালি দিয়ে উঠল, "অসাধারণ ফাদার! ভেনট্রিলোকুইজ়ম একটা ফাইন আর্ট। এবার বুঝতে পারছি ফাদার, আপনি কেন ঋজুলের কথা ভেবেছেন। আপনি একদম ঠিক ভেবেছেন ফাদার। ও কিন্তু ভেনট্রিলোকুইজ়ম শিখে পুতুলটাকে নিয়ে অনবদ্য সব শো করতে পারে। সত্যি কথা বলছি ফাদার, টিভিতে বা ইউটিউবে যখন আমি ওর কমেডি শো দেখি, ছাড়তে পারি না। সবাইকে ডেকে-ডেকে দেখিয়ে বলি, 'দ্যাখ, এ আমার বন্ধু। কী অসাধারণ প্রতিভা!' আর আমারও একটা ভাবনা খুলে গেল। ভয়েস রেকগনিশনের অ্যালগরিদ্‌মে আমরা যদি বাংলা ধ্বনি এভাবে ব্যবহার করি, তা হলে সেটা আরও কার্যকর হবে।"

ঋজুল ঈশানকে জড়িয়ে ধরে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ রে। আমারও তোর জন্য সব সময় গর্ব হয়।"

"এবার তা হলে পুতুলের ইতিহাসটা শুনি ফাদার," ঈশান বলল।

"ইতিহাসটা এখন শুনবে, না পুতুলটা একবার দেখে নিয়ে শুনবে?"

ঋজুল বলল, "পুতুলটা আগে দেখে নিই বরং। তর সইছে না। তারপর গল্পটা শুনব।"

ফাদার ফ্রেডরিক বললেন, "বেশ। আগে রাতের খাওয়াদাওয়া করে নাও। জবাহিরের বয়স হয়েছে। বেশি রাত পর্যন্ত ওকে জাগিয়ে না রাখাই ভাল। তারপর আমরা যাব পুতুলটা দেখতে।"

॥ ৭ ॥

ক্যাপ্টেন গড়াই একটা ঢেকুর তুলে ডিসেম্বরের শীতে কাঁপতে-কাঁপতে হাত ঘষতে-ঘষতে বলল, "চাউমিনটা খেয়ে অম্বল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে হতচ্ছাড়া দোকানদার বাসি চাউমিন গরম করে দিয়েছে।"

গুড্ডু একটা হেঁচকি তুলে বলল, "ভীষণ ঝাল ছিল। আমার জিভ পুড়ে গিয়েছে।"

ক্যাপ্টেন আর-একটা ঢেকুর তুলে বলল, "কঠিন-কঠিন বাংলা শব্দ বলে তোমার জিভের আর কিছু বাকি আছে নাকি, যে পুড়বে?"

বিল্লা বলল, "ঠিক বলেছেন। আমার কিন্তু বেশ লেগেছে। এই শীতে গরম-গরম চাউমিন। শ্রীধামে তো দু'বেলা বাসি ফলমূল আর নিরামিষ পরমান্ন খাই।"

"বাবাজিও বাসি ফলমূল খান নাকি?"

বিল্লা দু'হাত কানে ঠেকিয়ে বলল, "না, বাবাজির মেনু ঠিক করে দেন শ্রীব্রহ্মানাদ। তাতে খাসির মাংস, পোলাও সব আছে।"

"কানে হাত ঠেকালে কেন তুমি?"

"বাবাজি শিখিয়েছেন," বিল্লা আবার কানে হাত ঠেকিয়ে বলল,

"যতবার শ্রীব্রহ্মনাদের নাম নেবে, কানে হাত দিয়ে নাম নেওয়ার ধৃষ্টতার মার্জনা চাইবে। পুতুলটা কাঠের হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর থেকে পিশাচ, সব সিদ্ধ। ভীষণ জাগ্রত। জানেন তো, ব্রহ্মার একটা হ্যাপি বার্থডেতে স্বয়ং বিশ্বকর্মা শ্রীব্রহ্মনাদকে নিজের হাতে তৈরি করে ব্রহ্মাকে গিফ্‌ট দিয়েছিলেন। তারপর ব্রহ্মা একবার শ্রীব্রহ্মনাদকে নিয়ে হিমালয়ে বেড়াতে এসে ভুল করে একটা গুহায় ফেলে গিয়েছিলেন। বাবাজি স্বপ্নে সেই জায়গাটার সন্ধান পেয়ে নিজে গিয়ে শ্রীব্রহ্মনাদকে শ্রীধামে নিয়ে এসেছেন।"

ক্যাপ্টেন পায়চারি করতে-করতে বলল, "যত্ত সব! বাবাজির স্বপ্নে জি পি এস চলে নাকি? যাক গে! একটা গোপন কথা খোলসা করে বলে দেখি। ব্রহ্মনাদ থাকে তোমাদের আশ্রমে। জিনিসটা তো আসলে একটা কাঠের পুতুল। আমি ইন্টারনেটে ছবি দেখেছি। যতই পিশাচসিদ্ধ হোক, সে তো আর হাঁটতে-চলতে পারে না। তা হলে সে নর্থউড রেসিডেন্সিয়াল কনভেন্ট স্কুলের কফিনের মধ্যে কীভাবে গেল? আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

"সেটাই কিমাশ্চর্যম!"

"আহ! বাংলা ছেড়ে সংস্কৃতর কিমা চচ্চড়ি ধরলে নাকি? আশ্চর্য তো হয়েছি আমি! কিছুই মাথায় ঢুকছে না।"

বিল্লা, গুড্ডু নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, "তা জানি না। তবে কালীপুজোর দিন শ্রীধামে অনেক বাজি পোড়ানো হয়েছিল। মাঠের মধ্যে শামিয়ানা টাঙিয়ে বাবাজি শ্রীব্রহ্মনাদকে পাশে বসিয়ে বাজি পোড়ানো দেখছিলেন। এমন সময় একটা ছুঁচোবাজি এসে শ্রীব্রহ্মনাদের জামার ভিতর ঢুকে আগুন লেগে গিয়েছিল। তারপর কী হুটোপাটি, কী হুটোপাটি! সেখান থেকে শামিয়ানায় আগুন লেগে গেল।"

ক্যাপ্টেন পায়চারি থামিয়ে চোখ বড়-বড় করে বলল, "তার মানে কাঠের পুতুলটা আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে গেল?"

"না, না। শ্রীব্রহ্মনাদ ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন।"

"ভ্যানিশ?"

গুড্ডু হেঁচকি তুলে বলল, "হ্যাঁ, ভ্যানিশ।"

"যাহ বাবা! ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে স্কুলের কফিনের মধ্যে কীভাবে গেল?"

"বললাম না, তা আমরা জানি না। তবে শ্রীব্রহ্মনাদ বাবাজিকে স্বপ্নে বলেছেন, উনি ওই স্কুলে একটা বাক্সের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে বন্দি আছেন। অত্যন্ত গোপনে ওঁকে উদ্ধার করে শ্রীধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। উনিই তো শ্রীধামের সব ছিলেন। যত ভক্ত শ্রীধামে আসে শ্রীব্রহ্মনাদ নিজের মুখে তাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেন। নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে দেন।"

"মাথামুন্ডু দুর্বোধ্য। এ তো পুরো অলুক বহুব্রীহি!"

"মানে? আপনি কি আবার শুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন? অলুক, বহুব্রীহি এই শব্দদুটো তো বাবাজি শেখাননি।"

"দূর পাগল। অলুক বহুব্রীহি হচ্ছে বহুব্রীহি সমাসের এক প্রকার। বহুব্রীহি সমাস কত রকমের হয়, জান? আট রকমের। অবশ্য তোমাদের আর কী জিজ্ঞেস করছি। তোমরা তো আবার ক্লাস এইট ফেল। শোনো, যে বহুব্রীহি সমাসে আগের বা পরের পদের কোনও পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন, মাথামুন্ডু। বুঝলে কিছু?"

বিল্লা খানিকক্ষণ চুপ করে আকাশপাতাল ভেবে চোখ চকচক করে বলে উঠল, "বুঝেছি ক্যাপ্টেন। আপনি আমাদের মাথা মুণ্ডনের কথা বলছেন তো? ঠিক ধরেছেন। শ্রীব্রহ্মনাদ নিজের মুখে আমাদের মাথা মোড়াতে বলেছিলেন। না হলে ক্যাপ্টেন, জানেন, আমার ফিল্মস্টারের মতো চুলের স্টাইল ছিল।"

"আর আমার ফিল্মস্টারের মতো গোঁফ," হেঁচকি তুলে গুড্ডু বলল।

চুল-গোঁফের কথা বলে ন্যাড়া মাথা আর মুখে হাত বুলিয়ে গুড্ডু, বিল্লা দু'জনেরই মুখ দুঃখী-দুঃখী হয়ে উঠল। তারপরে বলার চেষ্টা করল, "তবে শ্রীব্রহ্মনাদ বলেছেন শ্রীধামে আমাদের সেবা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমাদের মাথায় অশেষ চুলের সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধিও গজিয়ে যাবে।"

"যাক গে, শোনো, ভেবে দেখলাম বাবাজি দিনটা মন্দ বাছেননি। আজ রাত্রিটা ভাল সময়। আজ রাতে এই বেসক্যাম্প থেকে আমরা তিনজনে হেঁটে প্রথমে অ্যাডভান্স বেসক্যাম্প অর্থাৎ স্কুলটায় পৌঁছে যাব। ফাঁকা স্কুল। শুধু বুড়ো পাদরি আর বুড়ো দরোয়ানটা আছে।

"তোমরা নিজের কানে শুনেছ, ব্রহ্মনাদ বলেছে?"

গলার কণ্ঠিতে হাত ঠেকিয়ে দু'জনই বলে উঠল, "হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। বললাম না, শ্রীব্রহ্মনাদ ঈশ্বরসিদ্ধ থেকে পিশাচসিদ্ধ।"

ক্যাপ্টেন পায়চারি থামিয়ে আর-একটা ঢেকুর তুলে বলল, "কীসে সিদ্ধ, কে জানে! মনে তো হচ্ছে নিপাতনে সিদ্ধ।"

গুড্ডু আর বিল্লা ফ্যালফ্যাল করে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, "আবার সব গোল-গোল হয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন।"

"ক্লাস এইটে গোল্লা পেয়েছ বলেই সব গোল-গোল মনে হচ্ছে। নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহির নামই তো শোনোনি। শোনো, নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি কোনও নিয়মের অধীনে নয়। ব্রহ্ম আর নাদ। তাদের সমাস কোন নিয়মে হচ্ছে? তার আগে আবার তোমরা শ্রী লাগিয়েছ। যাক গে, শোনো, ভেবে দেখলাম বাবাজি দিনটা মন্দ বাছেননি। আজ রাত্রিটা ভাল সময়। আজ রাতে এই বেসক্যাম্প থেকে আমরা তিনজনে হেঁটে প্রথমে অ্যাডভান্স বেসক্যাম্প অর্থাৎ স্কুলটায় পৌঁছে যাব। ফাঁকা স্কুল। শুধু বুড়ো পাদরি আর বুড়ো দরোয়ানটা আছে। সব দেখেশুনে অ্যাডভান্স বেসক্যাম্প থেকে টার্গেটে পৌঁছে সার্জিকাল স্ট্রাইকের মতো কাজটা আজকেই মিটিয়ে ফেলতে পারি।"

"সার্জিকাল স্ট্রাইকের মতো মানে?"

"উফ! বড্ড 'মানে, মানে' বলো তোমরা! মানে বলা কি তোমাদের মুদ্রাদোষ? সার্জিকাল স্ট্রাইক মানে টার্গেটকে তুলব আর বেরিয়ে আসব। এদিক ওদিক হাত লেগে যেন কোনও ঝনঝন-ঠনঠন না হয়।"

"তা হলে টার্গেটে পৌঁছনোর আগে অ্যাডভান্স বেসক্যাম্পে গিয়ে কী-কী করতে হবে?"

"কুল, কুল! আমার ঠান্ডা বরফের মতো মাথাটার উপর ভরসা রাখো। আগে পাঁচিলটা টপকাব। তারপর ওই টার্গেট ঘরটার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে পটাং করে তালাটা খুলে দেব। তা হলে আর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। আজকেই কেল্লাফতে।"

গুড্ডু আর বিল্লা সোৎসাহে বলে উঠল, "বহুব্রীহি! বহুব্রীহি!"

"যাক গে, শোনো, ভেবে দেখলাম বাবাজি দিনটা মন্দ বাছেননি। আজ রাত্রিটা ভাল সময়। আজ রাতে এই বেসক্যাম্প থেকে আমরা তিনজনে হেঁটে প্রথমে অ্যাডভান্স বেসক্যাম্প অর্থাৎ স্কুলটায় পৌঁছে যাব। ফাঁকা স্কুল। শুধু বুড়ো পাদরি আর বুড়ো দরোয়ানটা আছে।

ক্যাপ্টেন ভুরুটা ভয়ংকর রকম কুঁচকে বলল, "কী করে বুঝলে কেল্লাফতে বহুব্রীহি? তোমরা তো ক্লাস এইটে গোল্লা পেয়ে ফেল।"

দু'জনে জিভ কেটে বলল, "সরি ক্যাপ্টেন। উত্তেজনায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে। তা হলে মেক আপটা করে নিই?"

"কোনও ছদ্মবেশ নেওয়ার দরকার নেই। ঠান্ডা লাগলে জ্যাকেট বা সোয়েটার পরে নাও। তবে অবশ্যই দু'জনে মাথায় দুটো টুপি পরে নেবে। না হলে তোমাদের ন্যাড়া মাথায় চাঁদের আলো পড়ে যখন চকচক করবে, দূর থেকে দেখে মনে হবে গাড়ির হেডলাইট এগিয়ে আসছে। আর মনে আছে তো? পিছন থেকে টিকিদুটো যেন দেখা যায়।"

রাত্রি আর-একটু বাড়তেই ক্যাপ্টেন বিল্লা আর গুড্ডুকে নিয়ে রওনা দিল। কিছুটা পথ এগিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ি একটা পায়ে হাঁটা পথ ধরল ওরা। রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো চড়াই উতরাইয়ে ভরা। একমাত্র ক্যাপ্টেনেরই এই রাস্তাটা জানা ছিল। আধঘণ্টা হাঁটার পর হাঁফাতে-হাঁফাতে ওরা এক জায়গায় এসে পৌঁছল। সেখান থেকে লাল রংয়ের নর্থউড রেসিডেন্সিয়াল কনভেন্ট স্কুলটা দেখা যায়। চাঁদের আলোয় মায়াবী দেখাচ্ছে লাল রংয়ের স্কুলবাড়িটা। ক্যাপ্টেন ঘড়ি দেখল। রাত্রি প্রায় ন'টা। এই জায়গায় রাত্রি ন'টা মানে একেবারে নিশুতি নিঝুম। তার উপর শীতকাল। আগের বার চুরি করতে এসে দেখেছিল এই সময় সবাই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে পড়ে। তবু ক্যাপ্টেন সাবধান হয়ে বলল, "তোমরা বলছিলে পুলিশ রোজ একবার করে টহল দিয়ে যায়। ইনস্পেক্টর বক্সী কি এখনও এখানকার থানায় আছে?"

"জানি না তো! কেন ক্যাপ্টেন?"

ক্যাপ্টেন ঘাড়ে কালশিটে পড়া জায়গাটায় হাত বুলিয়ে বলল, "না, আমার সঙ্গে একটু জানাশোনা আছে, এই আর কী! তো এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশ ঘুরে গিয়েছে?"

ঠান্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে গুড্ডু হেঁচকি তুলে বলল, "বিলক্ষণ ক্যাপ্টেন। পুলিশ ঘুরে গিয়ে এখন লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।"

"গুড। মিশন শুরুর আগে এখানে এখন তা হলে আমরা ছোট্ট করে মিটিং করে নিই। শোনো, কাজটা করতে হয়তো আমাদের ঠান্ডা মাথায় ছড়িয়ে পড়তে হবে।"

"যা ঠান্ডা এখন! তা হলে মাথার টুপিটা খুলে নিই ক্যাপ্টেন? মাথাটা কনকনে ঠান্ডা থাকবে।"

"উফ! হ্যাঁ, তাই নাও। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যোগাযোগটা রাখা খুব জরুরি। যেহেতু আমাদের কাছে মোবাইল ফোন নেই আর তোমাদের ওই খেলনা ওয়াকিটকি দিয়ে কিস্যু হবে না, তাই আমরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখব পাখির ডাক দিয়ে।"

"পাখির ডাক?"

"হ্যাঁ। কোকিলের ডাক। এই দেখো, এরকম..." ক্যাপ্টেন কোকিলের ডাক নকল করে ডেকে উঠল, "কুউউউ, কুউউউ। এর মানে কোনও বিপদ নেই। অল ক্লিয়ার। আর বিপদ বুঝলে কু কু কু কু করে ডাকবে, বুঝলে?"

বিল্লা গুড্ডু দু'জনেই চুপ করে রইল। ক্যাপ্টেন অধৈর্য হয়ে ধমকে উঠল, "আহ! কপিড বলছ না কেন?"

"আমরা যে কোকিলের ডাক ডাকতে পারি না।"

"উফ! কাজের কাজ কিছুই পার না তোমরা! ছোটবেলায় লেখাপড়া তো করতে না। কোকিলের পিছনে লাগতে ডাকের লড়াই কখনও করোনি নাকি? চেষ্টা করো। চেষ্টা করো। খুব সোজা। এছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই। এই দ্যাখো, এরকম করে করো। কুউউউ, কুউউউ।"

গুড্ডু আর বিল্লা শুকনো মুখে নিজেদের মধ্যে তাকিয়ে চেষ্টা করল, "ক্যা...ক্যা..."

ক্যাপ্টেন তাড়াতাড়ি ওদের মুখ চেপে ধরল, "আচ্ছা গর্দভ তো তোমরা! মাঝরাতে এরকম হেঁড়ে গলায় কাকের ডাক ডাকতে বলেছি? এই ডাক শুনলে তো ইনস্পেক্টর বক্সী পর্যন্ত ঘুম ভেঙে উঠে দৌড়ে আসবে!"

"চিন্তা করবেন না। বুঝে গিয়েছি। আমরা পার্টনার তো। আমাদের ডাকের মানে আমরা ঠিক বুঝে যাব।"

ক্যাপ্টেন অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী? এখন আর ঠান্ডা মাথায় ভেবে কিছু আসছে না। যাক গে, আমি যখন কোকিলের ডাক ডাকব, খেয়াল রাখবে। কাকের ডাকে নয়, কোকিলের ডাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। তা হলে কেউ সন্দেহ করবে না। আর সময় নষ্ট নয়। আমরা এবার ধীরে-ধীরে স্কুলটার গেটের কাছে যাব। তারপর স্কুলের গেটটা বেয়ে উঠে ডিঙিয়ে ভিতরে যাব।"

গুড্ডু উৎফুল্ল হয়ে উঠে হেঁচকি তুলে বলল, "কপিড ক্যাপ্টেন। আমার তো পাঁচিল ডিঙোতে খুব ভাল লাগে। জানেন, পাঁচিলের মধ্যে খোলা গেট পেলেও আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকি..."

"চুপ। একদম চুপ। আমি কথা না বলতে বললে বলবে না। সাবধানের মার নেই। ভিতরে গিয়ে আমরা প্রথমে সোজা বুড়ো দরোয়ানের কোয়ার্টারে যাব। দরোয়ানটা কী করছে, আগে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে হবে, বুঝেছ?"

"কপিড," বিল্লা-গুড্ডু একসঙ্গে বলে উঠল।

ক্যাপ্টেনের পরিকল্পনা মতো তিনজনে নির্বিঘ্নে পাঁচিল টপকে স্কুলের ভিতর ঢুকে পা টিপে-টিপে জবাহিরের ঘরের কাছে এগিয়ে এল। ঘরের দরজাটা আলতো করে ভেজানো। ভিতর থেকে ভুরভুর করে মাংস রান্নার গন্ধ বেরচ্ছে। সেটা লম্বা শ্বাসে শুঁকে চোখটা আধবোজা করে বিল্লা উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যেতেই ক্যাপ্টেন ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইশারায় চুপ করতে বলে বিড়ালের ডাক নকল করে ডেকে উঠল, "ম্যাঁও!"

ভিতর থেকে জবাহির খুক-খুক করে কেশে বলে উঠলেন, "ক্যা রে মোতিয়া? ফির আ গ্যায়ি? আওর দুধ নেহি হ্যায়। অব যা ইধর সে।"

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ডেকে উঠল, "মিউ মিউ!"

"তু গ্যয়ি নেহি? আভি যা মোতিয়া। কাল সুভহে আনা। আভি হামকো ফাদারকে পাস খানা লাগানা হ্যায়।"

ক্যাপ্টেন সঙ্গে-সঙ্গে বিল্লা গুড্ডুকে বাইরের দেওয়ালের পাশে লুকিয়ে পড়তে বলে নিজেও লুকিয়ে পড়ল। একটু পরেই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন জবাহির। হাতে একটা ট্রে। তার উপর ঢাকা দেওয়া কয়েকটা পাত্র আর একটা ক্যাসেরোল। জবাহির খুক-খুক করে কাশতে-কাশতে হাঁটতে থাকলেন ফাদারের কোয়ার্টারের দিকে।

বিল্লা চোখ চকচক করে বলে উঠল, "বাব্বাহ! বুড়ো ফাদার এত রুটি-মাংস খাবে? এবার ভিতরে যাই ক্যাপ্টেন? যদি কিছু পড়ে থাকে।"

"ভিতরে যাবে। কিন্তু খেতে নয়। তুমি খাটের তলায় লুকিয়ে

চুপ করে শুয়ে থাকবে। ওয়াকিটকির একটা আমাকে দাও। আমি বাইরে আছি। আশা করি এই দূরত্বে ওয়াকিটকি কাজ করবে। খাটের তলায় কিন্তু চুপ করে শুয়ে থাকবে। বুঝেছ?"

বিল্লা বলল, "কপিড।"

"গুড্ডু, তুমি বুড়ো দরোয়ানটাকে লুকিয়ে ফলো করো। ফাদারের জানালার পাশেই পড়ার টেবিল। ওখানে ফাদারের মোবাইলটা থাকে। ওটা নিয়ে নিয়ো। হাতে নিয়েই প্রথমে সুইচ অফ করে দেবে। খালি খেয়াল রাখবে আমি কোকিলের ডাক দিয়ে কী বলতে চাইছি। বুঝেছ?"

গুড্ডু একটা হেঁচকি তুলে বলল, "কপিড।"

"তুমিও কোকিলের ডাক দিয়ে সিগন্যাল দেবে। বুঝেছ?"

গুড্ডু আর-একটা হেঁচকি তুলে বলল, "কপিড।"

"উফ্! এখনও হেঁচকি গেল না? জল খাও, জল খাও! মোবাইল চুরি করতে গিয়ে হেঁচকি তুলো না।"

॥ ৮ ॥

ফাদার ফ্রেডরিকের জন্য ডাল, রুটি আর ঈশান ও ঋজুলের জন্য কষা মুরগির মাংস, সঙ্গে স্যালাড। জবাহির পরিবেশন শুরু করতেই ঋজুল হাত ঘষতে-ঘষতে বলল, "উফ! জম্পেশ। ফাটাফাটি। ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম। নাহ্! জবাহিরচাচা, তোমার হাতের রান্না খেতেই এখানে এসে থাকতে হবে।"

ঈশান বলল, "যা বলেছিস। জবাহিরচাচা হচ্ছে বিশ্বের সেরা রাঁধুনি। আচ্ছা, দাঁড়াও জবাহিরচাচা, আমিও তোমার জন্য একটা জিনিস নিজে হাতে তৈরি করে নিয়ে এসেছি।"

ঈশান উঠে গিয়ে সুটকেস খুলে একটা রেডিয়ো বের করে এনে জবাহিরের হাতে দিয়ে বলল, "তুমি এটা রাখো জবাহিরচাচা। এটা দিয়ে তুমি পৃথিবীর সব দেশের সব রেডিয়ো স্টেশন শুনতে পাবে। কোনও ঝামেলা নেই। ভয়েস কম্যান্ড, মানে মুখে শুধু বলবে কোন দেশের কী গান শুনতে চাও, রেডিয়োটা তোমাকে সেই গান ইন্টারনেট থেকে শুনিয়ে দেবে।"

জবাহির রেডিয়োটা হাতে নিয়ে খুক-খুক করে কাশতে-কাশতে বললেন, "হামি কি ওতো জানি। তবে তুমি তৈয়ার করেছ আমি খুব যত্ন করব। সবাইকে দেখাব। সবাইকে গানা শোনাব।"

ঋজুল বলে উঠল, "আমার প্রোগ্রামও শুনো চাচা। আমিও রেডিয়োয় মাঝে-মাঝে বকবক করি।"

ঈশান বলল, "এই দ্যাখো, আমি রেডিয়োটা অন করে দিলাম। তুমি ঘরে গিয়ে ট্রাই করো। দেখো, তুমি চুপ করে থাকলে রেডিয়োটা মাঝে-মাঝে নিজের থেকেই তোমার সঙ্গে কথা বলবে, কী শুনতে চাও জানতে চাইবে। কাল তোমাকে সব ভাল করে দেখিয়ে দেব।"

ফাদার ফ্রেডরিক খুব খুশি হয়ে দেখছিলেন। জবাহির বেরিয়ে যেতে বললেন, "এই সার্কিটটাই বুঝি তোমার সেই আবিষ্কার, যেটা আমাকে ইমেলে জানিয়েছিলে?"

"ঠিক ধরেছেন ফাদার। মেশিন লার্নিং আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা নতুন সার্কিট। আমি এই সার্কিটের হাতঘড়িটাও আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি ব্যবহার করলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আর আমি রোবোটিক্স নিয়ে যে কাজকর্ম করেছি তার কিছু নমুনাও নিয়ে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে স্কুলের সায়েন্স ক্লাবের জন্য এগুলো রেখে দিয়ে যেতে চাই। পার্টসগুলো জুড়ে-জুড়ে ছাত্ররা খুব সহজেই নিজেরাই আধঘণ্টায় রোবট তৈরি করতে পারবে। আবার একই সঙ্গে ফিজিক্সের মেকানিক্যাল লিভার, ইলেকট্রিক্যাল মোটর, বেসিক ইলেকট্রনিক সার্কিট, এইসবের অ্যাপ্লিকেশনও দেখতে পারবে। আপনাকে এখন দেখাব ফাদার?"

"আগে বরং আমরা খেয়ে নিই। জবাহির গরম-গরম রান্না করে এনেছে। ঠান্ডা হয়ে যাবে," তার পরেই একটা কথা ফাদার ফ্রেডরিকের মনে পড়তে বলে উঠলেন, "এ হে! একটা মস্ত ভুল হয়ে গেল। জবাহিরকে বলাই হল না দরজার চাবিগুলো নিয়ে আসার জন্য। বেচারা একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আমরা খেয়ে চাবি আনতে গেলে ওকে হয়তো ঘুম থেকে তুলে চাবি আনতে হবে। তোমরা খেতে শুরু করো। আমি চট করে গিয়ে ওর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসি।"

"তুমি এটা রাখো জবাহিরচাচা। এটা দিয়ে তুমি পৃথিবীর সব দেশের সব রেডিয়ো স্টেশন শুনতে পাবে। কোনও ঝামেলা নেই। ভয়েস কম্যান্ড, মানে মুখে শুধু বলবে কোন দেশের কী গান শুনতে চাও, রেডিয়োটা তোমাকে সেই গান ইন্টারনেট থেকে শুনিয়ে দেবে।"

শুনেই ঋজুল আর ঈশান তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "কোনও প্রশ্নই ওঠে না ফাদার। আমরা যাচ্ছি।"

"যে-কোনও একজন গেলেই হবে," ফাদার বললেন।

"আমি যাচ্ছি," ঈশান বলল।

ঋজুল গলাটা গম্ভীর করে নিয়ে বলল, "অন্ধকার রাত। কোর্টইয়ার্ডের উপর কীরকম ছমছমে চাঁদের আলো। দু'পাশে লম্বা-লম্বা গাছ। তাদের ছায়ারা হাওয়ায় দুলে-দুলে কীরকম যেন বলছে 'আয়, আয়!' মেঘ আবার যখন-তখন ঢেকে ফেলছে চাঁদটাকে। তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোর্টইয়ার্ড পেরিয়ে তুই জবাহিরচাচার কোয়ার্টারে যেতে পারবি তো ঈশান? ভয় করবে না? অশরীরী কেউ যদি তোকে ফলো করে?"

ঈশান গলা চড়িয়ে বলল, "আস্পর্ধাটা একবার দেখেছেন ফাদার? এবার একেবারে আপনার সামনে! আপনি কিছু বলছেন না!"

ফাদার হাসি চেপে বললেন, "ওকে সবচেয়ে বড় পানিশমেন্টটা তো তুমিই দিয়ে দিতে পার। তুমি সোজা যাও। একটুও ভয় না পেয়ে চাবিটা নিয়ে চলে এসো। ঋজুলকে বুঝিয়ে দাও, তোমাকে ভয় দেখানোর সব চেষ্টা ওর পণ্ডশ্রম হচ্ছে। লিসন মাই চাইল্ড, ভয় জিনিসটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। আমাদের মধ্যে দুটো জিনিস আছে। মন আর মস্তিষ্ক। তোমার মন যদি বলে, 'আমি ভয় পাচ্ছি', তোমার মস্তিষ্ক সেরকমই ব্যবহার করবে। তোমার মন যদি একটা গাছের ছায়া বা ডালপালাকে অশরীরী ভূত বলে মনে করে, তোমার চোখ-কান মস্তিষ্কে সেই সিগন্যালই পাঠাবে।"

ঈশান মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে-বলতে বেরিয়ে গেল, "ঠিক বলেছেন ফাদার। টরন্টোয় আমার ল্যাব থেকে রাত্রিবেলায় এক কিলোমিটার দূরে আমার অ্যাপার্টমেন্টে হেঁটে ফিরি। মাঝে-মাঝে

বেশি রাত্রি হয়ে গেলে বেশ ভয়-ভয় করে, এবার থেকে আপনার কথা সবসময় মনে রাখব।"

পিছন থেকে ঋজুল গলা উঠিয়ে বলল, "আপাতত জবাহিরচাচার কাছ থেকে চাবিটা একটুও ভয় না পেয়ে নিয়ে আয়।"

ঈশান বেরিয়ে যেতে ফাদার ঋজুলকে বললেন, "এতদিন পর দেখা হচ্ছে তোমাদের। শুধু ওর পিছনে না লেগে বন্ধুত্বটাও উপভোগ করো। ভয় না দেখিয়ে ওকে সাহসী করে তোলো।"

"কী করব বলুন তো ফাদার? ওকে দেখলেই আমি এরকম করে ফেলি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওকে আমি সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মনে করি। ওর জন্য আমার কত গর্ব! ওর মতো ট্যালেন্টেড সায়েন্টিস্ট আমি আর একজনকেও চিনি না। আমি শুধু চাই ও যেন ওরকম ভূতের ভয়ে ভিতুর ডিম না হয়ে থাকে। অত বড় সায়েন্টিস্ট, পৃথিবীর আরও কত দেশে ঘুরবে, কত ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেবে। বিদেশের কত হোটেলে একা-একা থাকতে হবে। ওর এরকম ভিতু হলে চলে, বলুন ফাদার?"

"তা ঠিক। তবে এখন নিশ্চয়ই ভয় অনেক কমে গিয়েছে। এই তো বলল টরন্টোয় ওদের ল্যাব থেকে রাতে এক কিলোমিটার দূরে বাড়িতে হেঁটে ফেরে। এই তো দ্যাখো, অন্ধকার রাতে ও কেমন চাবি আনতে..."

ফাদার কথা শেষ করতে পারলেন না। আচমকা একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ঈশান ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঋজুল আর ফাদার খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। ফাদার জগ থেকে জল নিয়ে ওর মুখে ছিটিয়ে-ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। ঋজুল দেখল ঈশানের গা, হাত-পা একেবারে ঠান্ডা। তালু দিয়ে ঘষে-ঘষে গরম করার চেষ্টা করতে থাকল।

একটু পরে ঈশানের জ্ঞান ফিরতে উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে চাইল। ঋজুল ফাদারের ফ্রিজ থেকে খানিকটা দুধ বের করে ইন্ডাকশন হিটারে গরম করে ঈশানকে খাইয়ে খানিকটা চাঙা করে তুলে জানতে চাইল কী হয়েছিল? একটু ধাতস্থ হয়ে ঈশান বলতে শুরু করল, "এখান থেকে বেরিয়ে যেই কোর্টইয়ার্ডে পৌঁছলাম, দেখি পরিবেশটা ঋজুল যেমন বলল ঠিক সেরকম। কীরকম ছমছমে চাঁদের আলো। লম্বা-লম্বা পাইন গাছের ছায়ারা হাওয়ায় দুলে-দুলে কীরকম যেন বলছে, 'আয়, আয়।' আকাশের দিকে তাকালাম। একটা মেঘ এসে ঢেকে ফেলতে শুরু করতে লাগল চাঁদটাকে। বুকটা একটু ঢিপ-ঢিপ করছিল। কিন্তু ফাদার যেমন বলেছিলেন, আমি সমানে মনকে বোঝাচ্ছিলাম, 'ভয় পাব না, ভয় পাব না। এসবই প্রকৃতি। মন, মস্তিষ্ক...' এমন সময়..."

ঈশান থেমে যেতেই ঋজুল বলে উঠল, "এমন সময় কী হল?"

"সন্ধেবেলায় তুই যে লম্বা পাইন গাছটার তলা থেকে বেরিয়ে এসে ভয় দেখিয়েছিলি সেই গাছটার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, বারবার ওই গাছটার দিকে চোখ পড়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই গাছটার পিছনেই দেখলাম ভূত।"

"ভূত!"

"হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন ফাদার, ভূত ছাড়া কিছু হতেই পারে না। ন্যাড়া মাথা। মাথার পিছনে একটা টিকি। কপালে তিলক। আর

অদ্ভুত তার ব্যবহার। আমার সামনে এসে হেঁচকি তুলতে-তুলতে কঠিন বাংলা শব্দ বলছিল।"

ঋজুল হো-হো করে হেসে উঠল, "হেঁচকি তুলে-তুলে কঠিন-কঠিন বাংলা শব্দ। এমন ব্রহ্মদত্যির কথা জীবনে শুনিনি। কী বাংলা বলছিল?"

"ওফ! অত কি মনে আছে?" ঈশান মনে করার চেষ্টা করে বলল, "কীসব অবিমিশ্র... না না, অবিমৃষ্যকারী, উপাস্ত, জাজ্বল্যমান, বেগশালী... তারপর আরও আশ্চর্য! ওই ভূতটা বিদ্যুৎগতিতে সরসর করে পাইন গাছের উপর উঠে গেল। আমি আর তাকাইনি। কোনওরকমে এই ঘরে ফিরে এলাম।"

ঋজুল হতাশ গলায় বলল, "ফাদার, কাকে আপনি সাহসী হওয়ার এত উপদেশ দিলেন? ওর মন বলল পাইনগাছের পিছন থেকে জাজ্বল্যমান একটা ব্রহ্মদত্যি এসে হেঁচকি তুলে-তুলে ওকে কঠিন-কঠিন বাংলা শব্দ বলবে। তারপর সে বেগশালী হয়ে পাইন গাছের মাথায় উঠে যাবে। একে দিয়ে কিচ্ছু হবে না!"

ফাদার ঋজুলকে থামিয়ে ঈশানকে বললেন, "তুমি এখন কেমন বোধ করছ?"

"অনেকটা ভাল। কিন্তু বিশ্বাস করুন ফাদার, আমি সত্যিই দেখেছি।"

"ঠিক আছে। আমরা এটা নিয়ে পরে আলোচনা করব। আপাতত চলো, খেয়ে নিই।"

ঋজুল বলল, "খাওয়ার পরে কিন্তু পুতুলটা দেখতে যাব। তা হলে আমি গিয়ে জবাহিরচাচার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসি। চাবিটাই তো এইসব গোলেমালে আনা হল না।"

ফাদার দেওয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা হলে এক্ষুনি নিয়ে এসো। খেয়েদেয়ে গেলে জবাহির ততক্ষণে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। তখন ওকে আর ডেকে ঘুম থেকে তোলা ঠিক হবে না। বয়স হয়েছে ওর।"

ঋজুল মাথা ঝাঁকাল, "আমি এই যাচ্ছি আর নিয়ে আসছি ফাদার। আপনারা ততক্ষণে খেতে শুরু করুন।"

॥ ৯ ॥

জবাহির ঘরে ফিরে এলেন। ঘরের বাইরে একদিকের দেওয়ালে অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে রেখে খুব তীক্ষ্ণ চোখে জবাহিরের ফিরে আসাটা দেখল ক্যাপ্টেন শম্ভু গড়াই। জবাহিরের হাতে একটা রেডিয়োর মতো জিনিস। সেটা কেন নিয়ে এল, অনেক মাথা খাটিয়েও বুঝতে পারল না ক্যাপ্টেন। ওদিকে জবাহিরের ঘরের মধ্যে খাটের তলায় সেঁধিয়ে লুকিয়ে আছে বিল্লা। খাটের তলা থেকে শুধু জবাহিরের পা-দুটোই দেখতে পাচ্ছে। বিল্লার মনে হচ্ছে জবাহির রাতের খাওয়াদাওয়ার তোড়জোড় করছে। মাংসের হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলতেই মাংসের গন্ধে ঘরটা ভুরভুর করে উঠল। বিল্লার জিভে জল চলে এল। সেটা সামলাতে হাতে ধরা ওয়াকিটকিটা অসাবধানে শক্ত করে চিপে ধরতেই সেটা ঘড়ঘড় করে আওয়াজ করে উঠল।

ক্যাপ্টেনের ওয়াকিটকিতে সেই আওয়াজটা পৌঁছতেই ক্যাপ্টেন বুঝল বিল্লা এক্ষুনি কিছু বলতে চায়। ভীষণ বিরক্ত হল ক্যাপ্টেন। ওদের শিখিয়েছে ক্যাপ্টেন না বললে যেন ওয়াকিটকি অন না করে। বিরক্তিতেই ক্যাপ্টেন ধমকে উঠল, "কী হল কী?"

বিল্লা নিজের ভুল ঢাকতে বলল, "ভীষণ মশা। সব রক্ত খেয়ে নিচ্ছে।"

"বেশ করছে।"

জবাহিরের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছে? তারপর খাটের দিকে মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়ল ঈশানের দেওয়া রেডিয়োটার উপর। ছেলেটা বলেছিল বটে, চুপ করে থাকলে রেডিয়োটা মাঝে-মাঝে কথা বলে উঠবে। জবাহির একগাল হেসে খুক-খুক করে কেশে হাতের উপর বসা একটা মশা মেরে নিজের মনেই বলে উঠলেন, "ক্যা রেডিয়ো বনায়া বাবুয়া। আপনে আপ সে বোল রহা হ্যায়, মচ্ছর খুন পিতা হ্যায়।"

খাটের তলায় বিল্লা প্রমাদ গুনলেও ক্যাপ্টেন কিন্তু ওয়াকিটকিতে জবাহিরের গলা শুনে বুঝতে পারল খাটের তলায় যে বিল্লা লুকিয়ে আছে সেটা জবাহির বুঝতে পারেনি। দ্রুত চিন্তা করে বিল্লাকে ওয়াকিটকিতে বলল, "কম্যান্ডো আলফা। অ্যাকশন বললেই কুমিরের মতো এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে পা ধরে মারো টান।"

জবাহির খুক-খুক করে কাশতে-কাশতে নিজের মনে আবার বলে উঠলেন, "বড়িয়া রেডিয়ো ইস্টিশন হ্যায়। মগরমছ কি নৌটাঙ্কি হো রহা হ্যায়। বহুত খুব।"

ক্যাপ্টেন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে জবাহিরের ঘরের ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বাচ্চা কুকুরের গলা নকল করে ডেকে উঠল, "কুঁই কুঁই।"

জবাহির বললেন, "তুমভি ফির আ গ্যায়া ভুলুয়া? আজ তুমলোগ কো ক্যা হুয়া? ইতনা লালচ। ইতনা লালচ। অভি থোড়া দের পহলে মোতিয়া আয়া থা, অব তু? যা ইধর সে।"

ক্যাপ্টেন ওয়াকিটকিটা টিপে বলল, "অ্যাকশন।"

বিল্লা তৈরি হয়েই ছিল। আদেশ পেতেই খাটের তলা থেকে দ্রুত গতিতে বুক ঘষে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে আচমকা জবাহিরের পা-দুটো টেনে ধরতেই জবাহির ধপ করে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় 'হাই রাম' বলে উঠলেন। ধপ করে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে জবাহিরের গামছা দিয়েই জবাহিরের মুখটা বেঁধে ফেলল ক্যাপ্টেন। বিল্লা ততক্ষণে কাপড় টাঙানোর দড়িটা খুলে জবাহিরকে পিছুমোড়া করে বেঁধে ফেলে ক্যাপ্টেনের নির্দেশমতো খাটের তলায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "যাক বাবা, নিশ্চিন্ত। এবার তা হলে কী ক্যাপ্টেন?"

"অপেক্ষা। যতক্ষণ না কম্যান্ডো বিটার কাছ থেকে কোনও ক্লিয়ারেন্স সিগন্যাল না আসে, অপেক্ষা।"

বিল্লা খুব খুশি হল। চোখটা থেকে-থেকেই চলে যাচ্ছে মাংসের হাঁড়িটার দিকে। ক্যাপ্টেন যদি ভাগ না চায়, এই সুযোগে যেটুকু আছে সাবাড় করে দেওয়া যাবে। আনন্দের আতিশয্যে আবার কঠিন বাংলা বলে ফেলল, "ইত্যবসরে যৎসামান্য মাংসান্ন ভক্ষণ

খাটের তলা থেকে শুধু জবাহিরের পা-দুটোই দেখতে পাচ্ছে। বিল্লার মনে হচ্ছে জবাহির রাতের খাওয়াদাওয়ার তোড়জোড় করছে। মাংসের হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলতেই মাংসের গন্ধে ঘরটা ভুরভুর করে উঠল। বিল্লার জিভে জল চলে এল।

করে নিলে কেমন হয়?"

ক্যাপ্টেন চোখ থেকে আগুন ঝরিয়ে বলল, "মাথামুন্ডু! তোমায় এখন বিচিত্রকর্মা হতে হবে।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিল্লা বলল, "মানে ক্যাপ্টেন?"

"মাথামুন্ডুটা যে বহুব্রীহি সমাস, ভুলে গেলে? বিচিত্রকর্মাও বহুব্রীহি। বিচিত্র কর্ম যার, অর্থাৎ তুমি। মেক আপ করো। ফাস্ট, কুইক।"

ন্যাড়া মাথা চুলকে বিল্লা বলল, "কার মেক আপ?"

"আপাতত তোমার। একেবারে এই বুড়ো দরোয়ানটার মতো মেক আপ করো। তোমাকে হাঁটাচলা করতে দেখলে দূর থেকে যেন এই বুড়ো দরোয়ানটাই মনে হয়। মনে রাখবে পা-টা এই বুড়োটার মতো একটু টেনে-টেনে হাঁটতে হবে আর গলায় যেন খুকখুকে একটা কাশি থাকে। বাবাজি বলেছেন তিন মিনিটের মধ্যে তুমি নাকি এমন মেক-আপ করতে পার, চিন্তাই করা যায় না। যাক গে, তোমার কাজ তুমি শুরু করো আর আমাকে একটু চোখ বন্ধ করে ঠান্ডা মাথায় পরের প্ল্যান চিন্তা করতে দাও।"

মাংস খাওয়া হল না। বিল্লা মনের দুঃখ চেপেই ঝোলাব্যাগ থেকে মেক আপের জিনিস বের করে বসল। অবশ্য শীতকাল বলে এই মেক আপটা সোজা। বুড়ো দরোয়ানটা মাঙ্কি ক্যাপে গোটা মুখ ঢেকে রাখে। গলায় মাফলার। পোশাক তো ঘরের মধ্যেই রয়েছে। শুধু বাঁ গালের উপর একটা বড় আঁচিল, কপালে একটা কাটা দাগ আর তাগড়াই একটা পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ লাগিয়ে নিলেই হবে। বাবাজির মান রাখতে জবাহিরের মাথা থেকে মাঙ্কি ক্যাপ আর মাফলারটা খুলে বাকি মেক-আপটা করে আড়াই মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল।

খাটের উপর আয়েশ করে বসে ক্যাপ্টেন গড়াই তখনও চোখ বন্ধ করে ভেবে চলেছে এর পরের কাজটা কীভাবে করা যায়। এই জায়গাটাকে অ্যাডভান্স বেসক্যাম্প করে এর পর টার্গেটে পৌঁছে সার্জিকাল স্ট্রাইক করতে হবে। কিন্তু গুড্ডুর এখনও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এমন সময় ক্যাপ্টেনের মনে হল দূর থেকে "ক্যা...ক্যা..." করে একটা কাক ডেকে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ক্যাপ্টেনের মনে পড়ে গেল গুড্ডুকে কোকিলের ডাকে ডাকতে বললে কাকের ডাক ডাকে। গুড্ডু কীসের সিগন্যাল দিচ্ছে? পট করে চোখটা খুলে আরও জোরে চমকে উঠল ক্যাপ্টেন। যে বুড়ো দরোয়ানটাকে একটু আগেই মুখে গামছা বেঁধে পিছমোড়া করে বেঁধে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সে এখন সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে।

চমকে উঠে টালমাটাল হয়ে ক্যাপ্টেন খাট থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতেই বিল্লা তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেনকে ধরে ফেলে মাঙ্কি ক্যাপটা তুলে টিকিটা দেখিয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন, আমি কম্যান্ডো আলফা।"

ক্যাপ্টেন দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের অপ্রস্তুত অবস্থাটা বিল্লাকে বুঝতে না দিয়ে বলল, "আহ! বুঝতে পারব না কেন? বোঝার চেষ্টা করছি কম্যান্ডো বিটা কী সিগন্যাল দিচ্ছে!"

"আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কী?"

"কেউ এদিকে এগিয়ে আসছে।"

"তুমি কী করে বুঝলে?"

বিল্লা গোঁফে তা দিয়ে বলল, "আমরা তো পার্টনার। ঠিক বুঝতে পারি। দু'মিনিটের মধ্যে মিলিয়ে নেবেন, ঠিক বলছি কি না।"

দু'মিনিট মাত্র হাতে সময়। ক্যাপ্টেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "নাক ডাকতে পার?"

বিল্লা একমুখ হেসে বলল, "এইটা আমি খুব পারি ক্যাপ্টেন।"

ক্যাপ্টেন বিল্লাকে খাটে ঠেলে ফেলে শুইয়ে দিয়ে বলল, "নাক ডাকো! নাক ডাকো! যত জোরে-জোরে পার, নাক ডাকো। আর মধ্যে-মধ্যে ওই বুড়ো দরোয়ানটার মতো খুক-খুক করে কাশো।"

ক্যাপ্টেন দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে দিল। কিন্তু দরজায় একটা ফুটো আছে। সেই ফুটো দিয়ে ঘরের যে দেওয়ালটা দেখা যাবে না, সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিল্লার অনুমান ভুল হল না। দু'মিনিটের মধ্যে ঋজুল জবাহিরের কোয়ার্টারের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটু থমকে গেল। ভিতর থেকে নাক ডাকা আর কাশির আওয়াজ আসছে। ফাদার ঠিকই বলেছিলেন। জবাহিরচাচা ঘুমিয়ে পড়বেন। কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি হবে আশা করেনি। ঋজুল দরজায় অল্প টোকা মেরে ডাকল, "জবাহিরচাচা।"

ভিতর থেকে নাকের ডাক আর কাশি যেন আরও জোরে হয়ে গেল। ঋজুল দরজাটা ঠেলল। ভিতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। তবে দরজায় একটা ফুটো আছে। সেখানে চোখ লাগিয়ে দেখল ভিতরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে খাটের উপর জবাহিরচাচা শুয়ে কেমন যেন ফুলে-ফুলে উঠে নাক ডাকছে আর কেশে-কেশে উঠছে। ফাদার বোধ হয় এই জন্যই বলেছিলেন, জবাহিরচাচা ঘুমিয়ে পড়লে ওকে আর ঘুম থেকে তোলা ঠিক হবে না।

অগত্যা কাল সকাল ছাড়া গতি নেই। ফাদারের কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াল ঋজুল। আবার সেই কোর্টইয়ার্ড পেরিয়ে যেতে হবে। কোর্টইয়ার্ডটা অর্ধেক পেরনোর পর পিছন থেকে একটা কাকের ডাকের আওয়াজ পেল, "ক্যা... ক্যা..."

ঋজুল আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটু আগেই যখন জবাহিরচাচার কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিল তখন ঠিক এমনই একটা কাকের ডাকের আওয়াজ পেয়েছিল। আওয়াজটা মনে হয়েছিল বড় পাইন গাছটার মাথার দিক থেকে আসছিল। এত রাতে কাকের ডাক একটু বিচিত্র শোনালেও তখন এটা নিয়ে বিশেষ ভাবেনি। তবে এবার একটু চিন্তিত হল। প্রথমত আগের বারের ডাকটার তুলনায় এবারের ডাকটা একটু অন্য রকম। টানা-টানা। তা হলে কি এটা কাক না হয়ে অন্য কোনও পাখি, যে রাতে ডাকে? এই স্কুলের হোস্টেলে কত বছর কাটিয়েছে। কখনও তো এরকম পাখির ডাক শোনেনি। পাইন গাছটার কাছে এগিয়ে এল ঋজুল। পাইন গাছটার মাথার দিকে চাইল। ঠিক তখনই একটা কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদটাকে। পাইন গাছের মাথাটা অন্ধকারে মুড়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই শীতকালের ঝকঝকে আকাশে ফুটে উঠল অসংখ্য ঝিকমিকে তারা। ঋজুলের মনটা ভরে উঠল। কলকাতার আকাশে শুধু ধোঁয়া আর দূষণ। এরকম পবিত্র নির্মল ঝকঝকে আকাশে ছড়ানো হিরের টুকরো পৃথিবীর আর কোথায় দেখা যায়?

(ক্রমশ)

ছবি: কুনাল বর্মণ

বিগত ১৬ বছর ধরে একটু-একটু করে ডালপালা মেলে ক্রমাগত বেড়ে উঠছে এই প্রতিষ্ঠান।

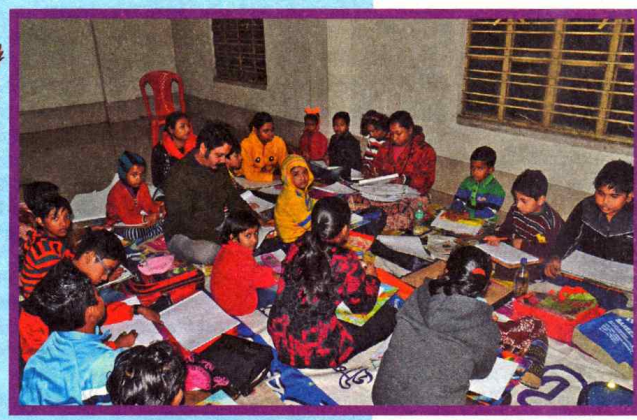

বারাসত সরস্বতী শিল্পায়ন অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বারাসতের সরস্বতী শিল্পায়ন অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রতি পা দিয়েছে ১৬ বছরে। প্রতিষ্ঠানের পথচলা শুরু হয়েছিল শিল্পী অপর্ণা মোদক ও তাঁর বাবা অরুণচন্দ্র মোদকের হাত ধরে। প্রথমে মাত্র চার-পাঁচজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে বাড়িতেই ক্লাস শুরু হয়েছিল। তারা একের পর-এক প্রতিযোগিতায় জিততে থাকলে আস্তে-আস্তে প্রতিষ্ঠানের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গত চারবছরে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী সরস্বতী শিল্পায়নে অনেক নতুনত্ব এনেছেন। এখন এখানে করানো হয় নানাবিধ কোর্স। পেন্টিংয়ের মধ্যে আছে প্যাস্টেল কালার, অয়েল কালার, চারকোল, অ্যাক্রিলিক কালার, পেনসিল স্কেচ, ইন্ডিয়ান আর্ট, ওয়েস্টার্ন আর্ট, যামিনী রায় আর্ট, মধুবনী, টেম্পেরা পেন্টিং, মিনিয়েচার পেন্টিং। ক্রাফ্টসে শেখানো হয় গ্লাস পেন্টিং, পট পেন্টিং, লিকুইড এমব্রয়ডারি, পেপার মোল্ড, বুটিক, বাটিক, ফেব্রিক এবং অরনামেন্ট মেকিং। সরকারি স্বীকৃতি ছাড়াও গত বছর পাওয়া গিয়েছে আই এস ও ৯০০১-২০১৫ সার্টিফিকেট। হস্তশিল্পের এত রকম প্রশিক্ষণের পিছনে আছে আগামী দিনে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্য, যাতে এগুলো শিখে ঘরে বসেই তাঁরা উপার্জন করতে পারেন। এখানে তিনবছর বয়স থেকে শুরু করে ৬০ বছর বয়সি মানুষও শেখেন। এই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বারাসতের শেঠপুকুর অ্যাথলেটিক ক্লাব, নেতাজিনগর স্পোর্টিং ক্লাব, পালপাকুরিয়া ক্লাব, কামাখ্যা মন্দির, পূর্বাশা ক্লাব, পূর্বাশা কাঁঠালতলা, আমতলা, বিবেকানন্দ রোড, রামমোহন পল্লী, বঙ্কিম পল্লী, মধ্যমগ্রামে সংহতি সংঘ ক্লাব, নিউ ব্যারাকপুর ও বিরাটির পুরনো বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক জায়গায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা আছে। এই কেন্দ্রগুলোয় বিভিন্ন বয়সি বাচ্চারা একসঙ্গে আঁকা শেখে। ফলে সবার প্রতি সমানভাবে মনোযোগ দিতে প্রতি ক্লাসে দু'জন শিক্ষক ক্লাস করান।

অপর্ণা মোদক ও বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

এখানকার ছেলেমেয়েরা নিয়মিত নানা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানেও তারা অংশ নিয়েছে ও পুরস্কৃত হয়েছে। স্কুলের নিজস্ব পরীক্ষা তো আছেই।

এবছর থেকেই একটি প্রদর্শনী চালু করার ইচ্ছে আছে স্কুল কর্তৃপক্ষের। এবছর সরস্বতী পুজোয় ২৪ পরগনার পুলিশ ও আর্মি পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে আঁকা ও হাতের কাজ শেখানোর পরিকল্পনা আছে এই প্রতিষ্ঠানের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই স্কুলে ফি অতি সামান্যই। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফি ১৩০ টাকা। বড়রা যাঁরা হাতের কাজ শিখছেন, তাঁদের সর্বোচ্চ ফি ২৫০ টাকা। অন্য একটি বিভাগে সর্বোচ্চ ফি ৫০০ টাকা।

আগামী দিনে সারা দেশে মোট ১০০টি স্কুল খোলার পরিকল্পনা আছে এই প্রতিষ্ঠানের। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা সেই স্কুলগুলোয় আঁকা শিখিয়ে স্বনির্ভর হতে পারবে। বাংলার বাইরে আঁকা শেখাকে শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ মনে করা হয়। এ রাজ্যে এখনও সে চল ততটা নেই। অথচ জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই আঁকার গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বজিৎবাবুদের তাই ইচ্ছে, আঁকা শেখায় মানুষকে আরও আগ্রহী করা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফারাক পাও

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

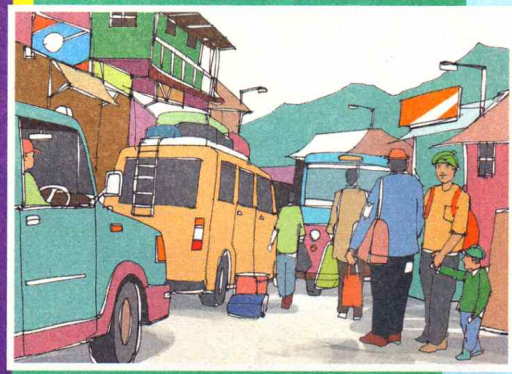

ছবি: প্রীতম দাশ

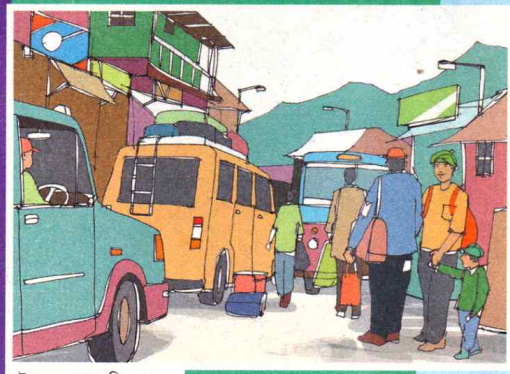

উত্তর: ৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়।

সুদোকু

১	২		৩		৯			
	৪							৮
৭			৮	১				
৬	৩			২		৫		১
		৯				৮		
৫		১		৭			২	৪
				৯	৪			২
৪							১	
			১		৬		৮	৭

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৯	৭	৫	৩	২	১	৬	৮	৪
৬	৩	৪	৮	৭	৯	২	৫	১
১	২	৮	৫	৪	৬	৯	৭	৩
৫	৮	৬	৯	৩	৪	৭	১	২
৭	১	৯	৬	৮	২	৪	৩	৫
২	৪	৩	১	৫	৭	৮	৯	৬
৮	৬	২	৭	১	৩	৫	৪	৯
৩	৯	৭	৪	৬	৫	১	২	৮
৪	৫	১	২	৯	৮	৩	৬	৭

গত সংখ্যার উত্তর

১। দূরে একটি লাইটপোস্ট অন্য রকম।
২। সামনে উঁচু কেবিনটির জানলা সরে গিয়েছে।
৩। চেয়ারের সামনে থাকা ব্যাগটির হাতল নেই।
৪। প্ল্যাটফর্মে রাখা জারটি নেই।
৫। প্ল্যাটফর্মের পিলারের গায়ে পোস্টারটি সরে গিয়েছে।
৬। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির জ্যাকেটের পকেটের রং বদলে গিয়েছে।
৭। দূরের বাড়িটির জানালা নেই।
৮। সামনের ইঞ্জিনটির হেডলাইট নেই।

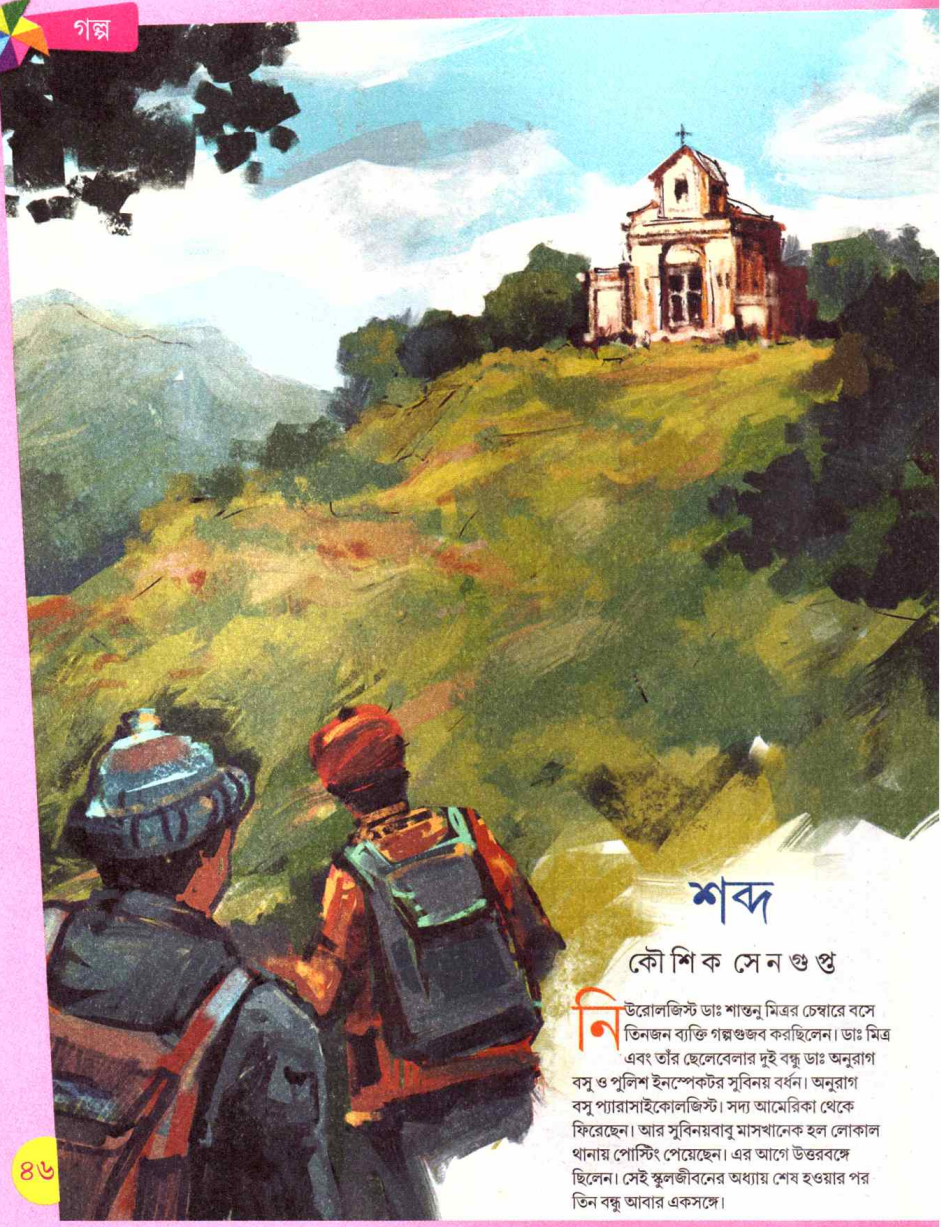

শব্দ

কৌশিক সেনগুপ্ত

নিউরোলজিস্ট ডাঃ শান্তনু মিত্রর চেম্বারে বসে তিনজন ব্যক্তি গল্পগুজব করছিলেন। ডাঃ মিত্র এবং তাঁর ছেলেবেলার দুই বন্ধু ডাঃ অনুরাগ বসু ও পুলিশ ইনস্পেকটর সুবিনয় বর্ধন। অনুরাগ বসু প্যারাসাইকোলজিস্ট। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। আর সুবিনয়বাবু মাসখানেক হল লোকাল থানায় পোস্টিং পেয়েছেন। এর আগে উত্তরবঙ্গে ছিলেন। সেই স্কুলজীবনের অধ্যায় শেষ হওয়ার পর তিন বন্ধু আবার একসঙ্গে।

ডিসপেনসারিতে আর রোগী নেই। ডাঃ মিত্রর তাই কোনও তাড়াও নেই। তিনি হাসতে-হাসতে বললেন, "স্কুলে আমরা ছিলাম থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স। অনুরাগের মাথায় যত দুষ্টু বুদ্ধি তৈরি হত। আর সেগুলো কাজে পরিণত করত সুবিনয়।"

সুবিনয়বাবু হেসে বললেন, "তুমিও বাপু শান্তশিষ্ট সুবোধ ছিলে না। আমাদের প্ল্যানগুলো কাজে পরিণত করার জন্য তুমি কেমন উৎসাহ দিতে, মনে পড়ে? তারপর যেই স্যারের কাছে ধরা পড়ে যেতাম, তুমি ভালমানুষ সেজে এমন ভাব করতে যেন কিছুই জান না।"

তিন বন্ধুই জোরে-জোরে হেসে উঠলেন। কম্পাউন্ডার আশুতোষ দু'-একবার উঁকি মেরে গিয়েছে। ডাঃ মিত্র ব্যাপারটা লক্ষ করে আশুতোষকে ডেকে বললেন, "তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। আমার এই বন্ধুদু'টি অনেকদিন পরে এসেছেন। ডিসপেনসারি আমি বন্ধ করে দিয়ে যাব।"

আশুতোষ গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আজ্ঞে, সেই বাসুদেব নামে লোকটা আজ আবার এসেছে। বলেছি ডিসপেনসারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কাল এসো। তা বলে কিনা, 'ডাক্তারবাবুর গাড়ি তো রয়েছে দেখছি। উনি যখন আছেন, একবার দেখা করেই যাই।'"

ডাঃ মিত্র ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবলেন, তারপর মনে পড়তে বললেন, "আজ আবার কী করতে এসেছে সে? ওকে তো সেদিন বলে দিলাম এক মাস পরে আসতে।"

"না ডাক্তারবাবু, আপনি আজই কিছু একটা করুন, পাগল হয়ে যাব না হলে..." বলতে-বলতে আশুতোষকে এক রকম ঠেলে উসকোখুসকো চেহারার একটা লোক চেম্বারে ঢুকে পড়ল।

ডাঃ মিত্র কঠোর গলায় বললেন, "চেম্বারে ঢুকতে হলে কম্পাউন্ডারবাবুর অনুমতি নিয়ে তোমায় ঢুকতে হবে। দেখছ না আমি এই দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি? কীরকম আক্কেল তোমার?"

বাসুদেব চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ডাঃ বসু আর সুবিনয়বাবু ঘাড় ঘুরিয়ে বাসুদেবকে একবার দেখলেন। নিতান্তই সাদামাটা চেহারার মানুষটা। বয়স পঁচিশের মধ্যে। চেহারায় গরিবিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। ডাঃ মিত্রর ফিজ় অনেক বেশি। সুবিনয়বাবু মনে-মনে আশ্চর্য হলেও বন্ধুকে বললেন, "আমরা বরং বাইরে গিয়ে বসছি, তুমি ওকে দেখে নাও।"

"আরে না-না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। ওকে আমি বলে দিয়েছি এক মাস পরে আসতে," এই বলে ডাঃ মিত্র বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী হল? কী সমস্যা হয়েছে তোমার?"

বাসুদেব মুখ তুলে বলল, "আবার সেই ব্যাপার ডাক্তারবাবু। কাল রাতে আরও বেশি করে শুনেছি। ঘুমোতে পারছি না। পাগল হয়ে যাব ডাক্তারবাবু।"

ডাঃ মিত্র বললেন, "ও কিছু না, ধীরে-ধীরে কমে যাবে। তোমার যা রোগ হয়েছে, একদিনে সারবে না। সামনের মাসে এসো, তখন দেখব। এখন যাও।"

বাসুদেব ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। ডাঃ বসু জিজ্ঞেস করলেন, "কী অসুখ হয়েছে ওর?"

ডাঃ মিত্র বললেন, "স্কিৎজোফ্রেনিয়া।"

সুবিনয়বাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, "রোগটার নাম শুনেছি। তবে বিশদে কিছু জানি না।"

ডাঃ মিত্র হাসিমুখে বললেন, "আচ্ছা, সহজ করে বলছি, এ এক ধরনের অডিটরি হ্যালুসিনেশন। কানের মধ্যে বিচিত্র সব শব্দ এসে ভিড় করে। ও বলে ওর কানের কাছে কারা যেন কথা বলছে, নানা রকম শব্দ হচ্ছে। বিশেষ করে ঢং-ঢং করে কোনও ঘণ্টা বাজার শব্দ প্রায়ই শুনতে পায় ও। আসলে এ সবই হল স্নায়ুঘটিত সমস্যা।"

সুবিনয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "অডিটরি হ্যালুসিনেশন! প্রথম শুনলাম। তা, এ রোগ সারবে?"

"সারে না। তবে ওষুধ খেয়ে কন্ট্রোলে রাখা যায়। অনেকটা চশমা কিংবা ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগারের মতো। এক-দু'বার অ্যাটাক হলে সুস্থ হলেও হতে পারে। এই লোকটার রোগ অনেক পুরনো। আজ থেকে বছরদশেক আগে রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। অভাব বলে ডাক্তার দেখায়নি। যত দিন গিয়েছে, উপসর্গ বেড়েই গিয়েছে। দিনের বেলা হয় না বললেই চলে, রাতে ব্যাপারটা বেশি ঘটছে। যত রাত বাড়ে, চারধার নিঝুম হয়ে যায়, ওর শ্রবণশক্তি তত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। নানা লোকের কথা এবং শব্দ কানে শুনতে পায়। ওষুধ চালু করে দিয়েছি। ওষুধের সঙ্গে-সঙ্গে সাইকোথেরাপিও চালু হয়েছে। আসলে লোকটা বেজায় গরিব, আর এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি।

তাই নিজের দায়িত্বে, এক রকম বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছি। হাজার হোক একটা বিরল ঘটনা।"

বন্ধুর কথায় গর্ব হল সুবিনয়বাবুর। নামী ডাক্তার হলেও গরিবের প্রতি দয়ামায়া আছে জেনে তিনি খুশি হলেন। সুবিনয়বাবু উঠে পড়লেন। বললেন, "রাত হল, আজ আমরা আসি।"

ডাঃ মিত্র বললেন, "একদিন বাড়িতে এসো তোমরা। জমিয়ে গল্প করা যাবে।"

ডাঃ বসু বললেন, "নিশ্চয়ই আসব। আজ আসি।"

॥ ২ ॥

দিনদুই পরে এক রাতে থানায় ডিউটি করছিলেন সুবিনয়বাবু। কনস্টেবল হরি সিংহ একজন লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এল। সুবিনয়বাবুর টেবিলের সামনে এসে বলল, "এ আদমি রাস্তায় সুইসাইড করতে যাচ্ছিল সাহাব। হামি সেখানেই টহল দিচ্ছিলাম। তুরন্ত সরিয়ে না দিলে লরির তলায় চলিয়ে যেত।"

সুবিনয়বাবু মুখ তুলে লোকটাকে

একপলক দেখে চমকে উঠে বললেন, "এ কী! তুমি বাসুদেব না?"

লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "আপনি আমায় চেনেন স্যার?"

"তুমি সেদিন ডাঃ মিত্রর ডিসপেনসারিতে গিয়েছিলে। আমি ছিলাম সেখানে। তা হঠাৎ সুইসাইড করতে যাচ্ছিলে কেন?"

বাসুদেব বলল, "না স্যার, মরতে যাব কোন দুঃখে? একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। নিজের মনে

রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছি। রাস্তাঘাট শুনশান, আশপাশে জনমনিষ্যি নেই। আচমকা মনে হল আমার হাতদুয়েক আগে কারা যেন চুপিসারে কথা বলতে-বলতে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের কথাবার্তা পরিষ্কার কানে আসছিল। অথচ মজার ব্যাপার, আমার আশপাশে কোথাও কোনও মানুষ তো দূরে থাক, রাস্তার একটা কুকুর পর্যন্ত ছিল না!"

সুবিনয়বাবু কৌতুকের সঙ্গে বললেন, "তারপর?"

"তারপর স্যার, আমিও হাঁটছি, কথাও কানে আসছে। মনে হল দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে হেঁটে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কথাবার্তা নয়, ওরা একটা ষড়যন্ত্র করছিল। আগামী কাল রাতদুটো নাগাদ শহরের গোরস্থানের আশপাশে কিছু একটা কাণ্ড করতে চলেছে তারা। একসময় মনে হল লোকদুটো রাস্তা পার হচ্ছে। আমিও শব্দ অনুসরণ করে রাস্তা পার হতে যাচ্ছি, এমন সময় এই পুলিশবাবু আমাকে জাপটে ধরে রাস্তার পাশে টেনে আনলেন।"

সুবিনয়বাবু হাসি চেপে বললেন, "ওসব তোমার মনের কল্পনা। মাঝরাতে শহরের রাস্তায় লোডেড ট্রাক চলাচল করে। হরি সিংহ না দেখতে পেলে এতক্ষণে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে! যাই হোক, তোমার অসুখের কথাটা না শুনলে তোমাকে নিশ্চয়ই হাজতে পুরতাম। যাও, আর কোনওদিন এরকম অবিবেচকের মতো রাস্তায় চলবে না।"

হরি সিংহ বাসুদেবের হাতের দড়ি খুলে দিল। বাসুদেব তবু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে দেখে সুবিনয়বাবু বললেন, "আবার কী হল? কিছু বলবে?"

বাসুদেব অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল,

"না স্যার, কল্পনা নয়। আগামী কাল রাতে গোরস্থানের আশপাশে নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে। আমি ওখানে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ আগেই লোকদুটো হেঁটে গিয়েছে। কথাগুলো একেবারে টাটকা। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। অনেকদিন ধরে অনেক শব্দই কানে আসে স্যার। কোন শব্দ টাটকা, কোনটা বাসি আর কোনটা পচা, তা বেশ বুঝতে পারি।"

বাসুদেব বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো বকবক করতে-করতে থানা থেকে বেরিয়ে গেল। সুবিনয়বাবু বোকার মতো বসে রইলেন।

আরও দু'দিন পরের ঘটনা। ডাঃ শান্তনু মিত্র চেম্বারে বসে রোগী দেখছেন। এমন সময় তাঁর মোবাইল ফোন বেজে উঠল। দেখলেন বিনায়কবাবুর কল। কানে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বলো।"

"শান্তনু, তোমার পেশেন্ট বাসুদেবের ব্যাপারে কিছু কথা ছিল।"

গত রাতে আমাদের দু'জন কনস্টেবল গোরস্থানের পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে বসেছিল। আসলে বাসুদেবের কথায় এমন কিছু ছিল, আমি পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারিনি। রাতের বেলা দু'জন কনস্টেবলকে তাই নজর রাখতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম গোরস্থানের পাশের জঙ্গলে।"

ডাঃ মিত্র অবাক হয়ে বললেন, "বাসুদেবের ব্যাপারে?"

বিনায়কবাবু অল্প কথায় সে রাতের ঘটনাটা ডাঃ মিত্রকে বললেন। ডাঃ মিত্র বললেন, "খুবই স্বাভাবিক। এই ধরনের রোগীরা আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। বাস্তব দুনিয়া থেকে সরে গিয়ে কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়ায়। সে নিজেও বুঝতে পারে না কী করছে, কোথায় যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা ঘটা তাই আশ্চর্য নয়।"

"কিন্তু শান্তনু, এক্ষেত্রে বাসুদেবের কথা অদ্ভুতভাবে মিলে গিয়েছে। গত রাতে আমাদের দু'জন কনস্টেবল গোরস্থানের পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে বসেছিল। আসলে বাসুদেবের কথায় এমন কিছু ছিল, আমি পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারিনি। রাতের বেলা দু'জন কনস্টেবলকে তাই নজর রাখতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম গোরস্থানের পাশের জঙ্গলে।"

"তারপর?"

"তারপর রাত দুটো নাগাদ জনাচারেক ব্যক্তি একটা কফিন বয়ে এনে গোরস্থানে ঢোকে। তাদের গতিবিধি দেখে কনস্টেবলদের সন্দেহ হয়। সরাসরি তারা গিয়ে হইহই করতেই লোকগুলো কফিন ফেলে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। কফিন খুলে কী পাওয়া গিয়েছে জান?"

"কী?"

"ডেডবডি নয়, অনেক সোনার বাট। কফিনে পুরে রাতের অন্ধকারে পাচার হচ্ছিল।"

"মাই গড! এসব তুমি কী বলছ?"

সুবিনয়বাবু বললেন, "শান্তনু, আমার মনে হয় তোমাকে আরও খুঁটিয়ে বাসুদেবের কেসটা স্টাডি করতে হবে। এটা আদৌ কোনও অসুখ, নাকি অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা, আমি জানি না। তবে পাগলের প্রলাপ নয়, এ নিশ্চয়তা আমি তোমায় দিতে পারি।"

ডাঃ মিত্র অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, "বেশ, তাই হবে। আমি দেখছি কী করতে পারি।"

॥ ৩ ॥

বাসুদেবকে নিয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ডাঃ মিত্র। যখনই সময় পান, ওকে ডেকে এনে কথা বলেন। বাসুদেবের অগোছালো কথাগুলো রেকর্ড করে অবসর সময়ে সেগুলো মন দিয়ে শোনেন।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন ফাঁকা একটা ঘরে বাসুদেবকে বসিয়ে ডাঃ মিত্র বললেন, "তুমি আসার কিছুক্ষণ আগে আমি আর আমার কম্পাউন্ডার আশুতোষ এই ঘরে বসে কথা বলছিলাম। তুমি তো অনেক কথাই শুনতে পাও। দেখো দিকি, আমাদের কথাগুলো শুনতে পাও কিনা!"

রাতের বেলা বাসুদেবের অদ্ভুত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়, তাই সেদিন রাতেই এই পরীক্ষাটা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন ডাঃ মিত্র। বাসুদেবকে ঘরে বসিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ঢুকলেন মিনিটপনেরো পর। দু'কাপ ধূমায়িত কফি নিয়ে একটা কাপ বাসুদেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "কিছু শুনতে পেলে?"

বাসুদেব ফিক করে হেসে বলল, "এ আর এমন কী ডাক্তারবাবু? একেবারে টাটকা শব্দগুলো। প্রথমে একটা কাচের গ্লাস ভাঙার শব্দ পেয়েছি। তারপর কিছু কথা কানে এসেছে। আপনি আর আশুদা আমার ব্যাপারেই কথা বলছিলেন। আপনি আশুদাকে বলছিলেন আমার এই অসুখের একটা হিল্লে করতে পারলে আপনি থিসিস লিখবেন।"

ডাঃ মিত্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তক্ষুনি কোনও কথা তাঁর মনে এল না। এ যে অসম্ভব ব্যাপার! শব্দতরঙ্গ উৎপত্তিস্থল থেকে নির্গত হয়ে বাতাসের এক অণু থেকে অন্য অণুতে ছড়িয়ে পড়ে। যত

বেশি ছড়ায়, তরঙ্গ তত দুর্বল হতে থাকে। একসময় শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তা হলে কি বাসুদেবের অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে? বিলীন হয়ে যাওয়া শব্দ তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে? না হলে বাসুদেব এখানে আসার বেশ কিছুক্ষণ আগে এই ঘরে তিনি ইচ্ছে করেই একটা কাচের গ্লাস আছড়ে ভেঙেছেন। এ কথাটা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তা ছাড়া বাসুদেবের মতো অল্পশিক্ষিত একজন মানুষের পক্ষে থিসিস লেখার কথাটা বানিয়ে বলা সম্ভব নয়।

"জানেন ডাক্তারবাবু, টাটকা শব্দগুলো কানে এলে ততটা কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় অনেক পুরনো হয়ে যাওয়া শব্দগুলো যখন কানের কাছে ঘোরাফেরা করে। স্পষ্ট বুঝতে পারি না, বোঝার চেষ্টা করতে গেলেই মাথার মধ্যে যন্ত্রণা করে। আবার এড়িয়েও যেতে পারি না," বাসুদেব হতাশ হয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল।

ডাঃ মিত্র বললেন, "কত পুরনো শব্দ তুমি শুনতে পেয়েছ?"

উত্তরে বাসুদেব অদ্ভুত সব কথা বলতে লাগল। তাদের পাড়ায় যারা মারা গিয়েছে বহুদিন আগে, সেইসব মানুষের বাড়ি গিয়ে নাকি তাদের কথাও শুনতে পেয়েছে বাসুদেব। বেঁচে থাকতে তারা যেসব কথা বলেছিল। কফির কাপ নামিয়ে রেখে সে বলল, "এ তো কিছুই না ডাক্তারবাবু। আমার সবচেয়ে মুশকিল হয় ওই ঘণ্টার শব্দে। সে শব্দ শুরু হলে কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করে। শরীরটা কেমন অস্থির-অস্থির করতে থাকে।"

"হ্যাঁ, তুমি আগেও অনেকবার বলেছ বটে। মস্ত বড় কোনও ঘণ্টার আওয়াজ। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বেজে ওঠে। আচ্ছা একটা কথা বলো, এই ঘণ্টার শব্দটা কি খুব পুরনো?"

বাসুদেব বলল, "অনেক পুরনো। যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসে। ঘণ্টা বাজার পরে প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তার পরেই মাথার ভিতর যন্ত্রণা হয়।"

ডাঃ মিত্র গুম হয়ে বসে রইলেন।

॥ ৪ ॥

ব্যাপারটা আর গোপন থাকল না। খবরের কাগজে বাসুদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ফলাও করে ছাপা হল। অনেকেই বাসুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। এদের মধ্যে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষজনও ছিল, যারা মোটা টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাসুদেবের অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে ব্যবসা করতে চায়। ডাঃ মিত্র বাধ সাধলেন। সাফ জানিয়ে দিলেন, যেহেতু বাসুদেব তাঁর চিকিৎসাধীন, তাই তিনি এই ধরনের কাজে অনুমতি দেবেন না। অনেক ভেবে প্যারাসাইকোলজিস্ট অনুরাগ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ডাঃ মিত্র। বাসুদেবের কেস হিস্ট্রি সমস্ত বলার পর বললেন, "আমি তো কোনও আলোই দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমে ভেবেছিলাম, অডিটরি হ্যালুসিনেশন। সেই মতো চিকিৎসাও শুরু করেছিলাম। পরে বুঝলাম বাসুদেবের অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে। বিলীন হয়ে যাওয়া শব্দ তার শ্রবণেন্দ্রিয় শুনতে পায়। আমার মনে হয় বাসুদেবের কেসটা তোমার দেখা উচিত।"

ডাঃ বসু বললেন, "ঘণ্টার ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? শুধু ওই শব্দটা কানে বাজলে বাসুদেব পাগলের মতো হয়ে যায়, তার মাথায় যন্ত্রণা হয়। বাসুদেবের কথামতো ঘণ্টার আওয়াজ প্রতি ঘণ্টায় শোনা যায়, তার মানে গির্জার ঘণ্টা হওয়া সম্ভব। সে আরও বলেছে, ঘণ্টা বাজার পরে প্রতিধ্বনি হয়, তার মানে ধরে নেওয়া যেতে পারে পাহাড়ি অঞ্চলের কোনও গির্জা।"

ডাঃ মিত্র অবাক হয়ে শুনছিলেন। এসব চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি। ডাঃ বসু বললেন, "আচ্ছা, বাসুদেব কি পাহাড়ি অঞ্চলে কখনও গিয়েছিল? বিশেষ করে ছেলেবেলায়? আসলে মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়ার আগে কিছু দৃশ্য বা শব্দ মানুষের মনে আজীবন গেঁথে যায়। পরবর্তী কালে স্বপ্নে বা অবচেতনে সেই সব দৃশ্যপট বা শব্দ আনাগোনা করে।"

ডাঃ মিত্র বললেন, "হতেও পারে। আমি এভাবে চিন্তা করিনি। এইজন্যই তোমাকে দায়িত্ব নিতে বলছি। তবে বাসুদেবের ব্যাপারে যতটুকু জানি, নিতান্তই গরিব ছেলে। শুনেছি অনাথআশ্রমে মানুষ হয়েছিল। কোনও একটা কারখানায় পার্টটাইম লেবারের কাজ করে। জীবনে পাহাড় বা সমুদ্র দেখেছে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া তুমি অন্যদিকগুলোও একটু ভেবে দেখো। থানায় গিয়ে সুবিনয়ের কাছে জলজ্যান্ত প্রমাণ দিয়ে এসেছে সে। আমি নিজেও ওকে বিভিন্ন রকম ভাবে পরীক্ষা করেছি।"

ডাঃ বসু খানিক অন্যমনস্ক হয়ে কী চিন্তা করে তারপর বললেন, "ঠিক আছে, তুমি বাসুদেবের কেসটা আমাকে হ্যান্ডওভার করে দাও। আমি ওকে নিজের কাছে কিছুদিন এনে রাখতে চাই।"

"সত্যিই কি এই কেসে নতুন কিছু পাওয়ার আছে আমাদের? আই মিন, মেডিক্যাল সায়েন্সের নতুন কোনও দিক?"

ডাঃ বসু বললেন, "বলা মুশকিল, তবে চেষ্টা করতে দোষ কী?"

কথামতো বাসুদেবের সমস্ত কেস হিস্ট্রি বন্ধুকে বুঝিয়ে দিলেন ডাঃ মিত্র। বাসুদেবও রাজি হল ডাঃ বসুর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাতে। যেমনভাবে হোক, সে এইসব শব্দের ভিড় থেকে মুক্তি পেতে চায়।

মাসতিনেক অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ডাঃ মিত্র তাঁর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাসুদেবের কথা তাঁর মন থেকে মুছে যেতে বসেছিল। হঠাৎই একদিন একটা ইমেল পেলেন। ইমেলটা পাঠিয়েছেন তাঁর বন্ধু ডক্টর অনুরাগ বসু।

তিনি লিখেছেন, "ভাই শান্তনু, তোমাকে কীভাবে খবরটা দেব ভেবে উঠতে পারছি না। মনের অবস্থা অত্যন্ত অগোছালো। এই মুহূর্তে আমি ডাফলা হিল থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে একটা হাসপাতালে আছি। বাসুদেব এই হাসপাতালে ভর্তি। ডাফলা কোথায় জান তো? অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তে একটি পার্বত্য এলাকা। বাসুদেব আপাতত সুস্থ আছে। তার অসুখটাও সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে।

"এবার তোমাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলি। বাসুদেবের কেসটা নিয়ে দিন-রাত এক করে দিয়েছিলাম। ঘণ্টার শব্দ শোনার সময় আর কোনও শব্দ শোনা যায় কি না, এই কথাটা বাসুদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রথমে সে উত্তর দিতে পারেনি। ওকে বলেছিলাম চেষ্টা করতে। ঘণ্টার শব্দ শুরু হওয়ার আগে বা পরে কোনও শব্দ যদি সে কিছু শুনে থাকে, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলতে। বাসুদেব চেষ্টা করত। ওই সময় তার খুব কষ্ট হত। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠত। একদিন সে সফল হল। বলল, ও নাকি ঘণ্টা বাজার মুহূর্তখানেক আগে অস্পষ্ট কিছু কথা শুনতে পেয়েছে। কথাগুলো আমাদের পরিচিত ভাষায় নয়। বাসুদেবের মুখে সেই অচেনা শব্দগুলো শোনার পর আমার এক ভাষাবিদ বন্ধুর সাহায্যে জেনেছিলাম ওগুলো

ডাফলা ল্যাঙ্গুয়েজ। ডাফলা হিলে পার্বত্য উপজাতিদের বাস। তারাই ও ভাষায় কথা বলে। সন্ধান নিয়ে জানলাম, ব্রিটিশ আমলে তৈরি পুরনো একটা গির্জাও ওখানে আছে।

"তুমি তো আমায় ভালভাবেই চেন। কোনও কাজ শুরু করে তার শেষ না দেখে থাকতে পারি না। বাসুদেবকে নিয়ে তাই বেরিয়ে পড়লাম। ডাফলা হিলে পৌঁছে বাসুদেবের আচরণে কিছু পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিলাম। জায়গাটা যেন তার অত্যন্ত পরিচিত, এমনটাই আমার মনে হচ্ছিল। তার চোখ-মুখে খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছিল। তুমি বলেছিলে, বাসুদেব কস্মিনকালেও পাহাড় দেখেনি, অথচ যেরকম দক্ষতার সঙ্গে সে পাহাড়ের প্রত্যেকটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যাচ্ছিল, চোখে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হত না!

"তারপর সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটা এল। বাসুদেবকে নিয়ে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত গির্জায় উপস্থিত হলাম। পুরনো গির্জা। দুটো থামের মাঝে বেশ খানিকটা উঁচুতে প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝোলানো। দড়ি ধরে টানলে ঘণ্টা বাজতে থাকে। আশপাশের পাহাড়ের গায়ে শব্দতরঙ্গ আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনি ডুকরে ওঠে। ঘড়ি মিলিয়ে প্রতি ঘণ্টায় দড়ি টানার জন্য একজন লোক গির্জায় থাকে। আমার ধারণার সঙ্গে সমস্ত কিছুই হুবহু মিলে যাচ্ছিল। গির্জার সামনে এসে বাসুদেব কেমন যেন থমকে গেল। আমার মনে হয়েছিল অনেক কথাই ও মনে করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। আমি তাকে বললাম, 'এই ঘণ্টার শব্দই তুমি দিন-রাত শুনতে পেতে। দেখো দিকি, আমার কথা ঠিক কি না!' এই বলে আমি দড়ি ধরে জোরে-জোরে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে অঘটন ঘটে গেল। দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে প্রচণ্ড চিৎকার করে বাসুদেব জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

"ভাই শান্তনু, ডাফলা হিলের কিছু প্রবীণ মানুষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ওই গির্জায় যে ঘণ্টাবাদক ছিল, তার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর ওই উপত্যকায় গল্প হয়ে আছে। দড়ি ছিঁড়ে প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা ঘণ্টাবাদকের মাথার উপর পড়েছিল।

"আশা করি, এবার সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তোমার কাছে? গতজন্মে বাসুদেব ছিল ওই গির্জার ঘণ্টাবাদক। মৃত্যুর আগে গির্জার ঘণ্টার শব্দ শেষবারের মতো শুনেছিল সে। পূর্বজন্মের স্মৃতি হয়ে তাই ওই বিশেষ শব্দই তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঘুরেফিরে আসত। এর ফলে বাসুদেবের শ্রবণেন্দ্রিয় এতটাই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল যে বিলীন হয়ে যাওয়া শব্দতরঙ্গও সে পরিষ্কার শুনতে পেত। জানি মেডিক্যাল সায়েন্স এই যুক্তি স্বীকার করবে না। তবে বাসুদেব এই মুহূর্তে একজন সুস্থ মানুষ, এখানেই আমাদের জিত। আমরা আগামী সপ্তাহে ফিরছি। সাক্ষাতে আরও বিস্তারিত বলব। আর তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এমন একটা বিরল কেস আমাকে হ্যান্ডওভার করার জন্য। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা থাকুক বা না থাকুক, আমার সাবজেক্টের অনেকটাই রসদ আমি পেয়েছি বাসুদেবের কেসে। ভাল থেকো।

"তোমার বন্ধু অনুরাগ।"

ডাঃ মিত্র বিস্মিত হয়ে ভাবলেন এমনটাও সম্ভব!

ছবি: প্রীতম দাশ

মজার ঝাঁপি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজিক্যাল মিউজ়িয়ামের তরফ থেকে ১৪-১৮ জানুয়ারি আয়োজিত হল ৪৬তম 'পূর্ব ভারতীয় সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ার'। পূর্ব ভারতের ১৩টি রাজ্য থেকে ২০০টির উপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ ছাত্রছাত্রী তাদের তৈরি মডেল এবং প্রদর্শনবস্তু নিয়ে

উপস্থিত ছিল এই মেলায়। বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন দর্শক হিসেবে। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়।

শিক্ষণীয় ছড়ার বই

'গজিয়ে ওঠার মতো/ জমিটুকু না পেলে/ কী আর ভরবে ক্ষেতে/ টুসটুসে আপেলে? শহর কেবলই বাড়ে-/কেবলই সবুজ খায়,/ প্রাণী আর উদ্ভিদ/ মরে তার সীমানায়।'

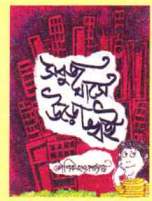

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সবুজ ঘাসে উড়ো খই-এ ছড়িয়ে আছে এরকম ছোট-ছোট দক্ষ হাতে লেখা ছড়ার কুচি। তাদের বিষয়ে যেমন রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া, তেমনি আছে স্মৃতিমেদুরতা। কখনও লিমেরিক, কখনও আবার পয়ারে বাঁধা বইয়ের কবিতাগুলো বিষয়বৈচিত্রে যেমন ভাবায়, তেমনি লেখার গুণে মোহিত করে। ছোটদের সঙ্গে বড়দেরও আনন্দ দেবে এই বই। তবে সুন্দর ছড়াগুলোর তুলনায় বইয়ের ছবিগুলো একটু যেন ম্লান। একই কথা প্রযোজ্য প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও।

দাম: ১৩৫ টাকা
সুমিত্রা প্রকাশনী

দারুণ মজার ফেস্টিভ্যাল

৪ ও ৫ জানুয়ারি নিকো পার্কে আয়োজিত হয়েছিল 'সোনি ইয়ে জায়ান্ট হুইল ফেস্টিভ্যাল'। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে হাজারের মতো খুদে বাড়ির বড়দের হাত ধরে জড়ো হয়েছিল। ছোটদের আনন্দ দেওয়ার জন্য হাজির ছিল সোনি ইয়ে-র বিখ্যাত চরিত্র হানি বানি, গুরু বোলে এবং কিক-ও। তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে হাজির হয়েছিলেন বিখ্যাত তারকা দেব অধিকারী। তাঁর চমৎকার পারফরম্যান্সে ছোট থেকে বড় সবাই মেতে ওঠে।

অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছিল লোভনীয় খাবারের পসরাও। এছাড়াও ছিল ম্যাজিক, জুম্বা নাচ, বিজ্ঞানের মজাদার এক্সপেরিমেন্ট। দু'দিনের কার্নিভালে বছরের শুরুতেই নানাভাবে ছুটির মেজাজ উপভোগ করার সুযোগ পেল কলকাতার ছোটরা।

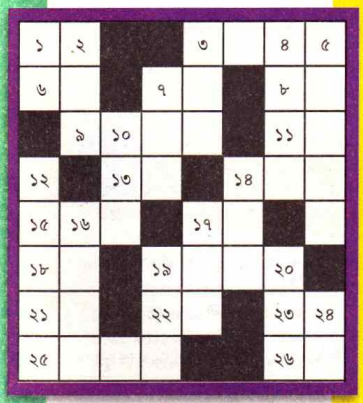

পা শা পা শি

১। দেব যোগ করলেই শ্রীকৃষ্ণ।
৩। অসমর্থ।
৬। যে রংয়ে সব রং আছে।
৭। সম্মতি।
৮। খোলার উলটো।
৯। মহিলা মালিক।
১১। লক্ষ্মীর আর-এক নাম।
১৩। বৌদ্ধ দর্শন।
১৪। ঝগড়া।
১৫। দাঁত।
১৭। যা করা থাকলে মৃত্যুর পর পরিজনরা টাকা পান।
১৮। যা থেকে আটা, ময়দা এসব হয়।
১৯। ওড়িশার প্রধান নদী।
২১। আরব্যোপন্যাসের পাখি।
২২। কোনও কিছু ধারালো করার জন্য যা দেওয়া হয়।
২৩। বাড়ি।
২৫। খুব নরম সুতির কাপড়।
২৬। ধ্বংস। ছন্দ।

উপর-নীচ

১। পাখি যেখানে থাকে।
২। শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
৩। পথ।
৪। জাঁকজমক।
৫। হনুমান বিশল্যকরণীর জন্য যা তুলে এনেছিল।
৭। ঠিকানা।
১০। আগেকার দিনে লজেন্সকে বাচ্চারা যা বলত।
১২। জমজমাট।
১৪। উড়োজাহাজ।
১৬। আগুন জ্বললে এর ডাক পড়ে।
১৭। সকাল।
১৯। ডাকাতরা আগেকার দিনে এটি নিয়ে ডাকাতি করতে বেরত।
২০। বড়-বড় চোখ হলে এই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়।

গত সংখ্যার সমাধান

শালুক

মুরগি বানাও কাগজ কেটে

নিজের হাতে

উপকরণ: এ ফোর সাইজের লাল, হলুদ ও সাদা রংয়ের কাগজ, স্কেচপেন, আঠা, কাঁচি।

কীভাবে করবে:

১। এ ফোর সাইজের লাল কাগজ থেকে ছবিতে (১) যেভাবে দেখানো হয়েছে, অমনভাবে একটা ত্রিভুজাকৃতি অংশ কেটে নিতে হবে।
২। ওই অংশটায় ছবিতে (২) যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে মাঝখান থেকে ভাঁজ ফেলে রাখব।
৩। এবার ত্রিভুজের দুটো ডানাকে আবার মাঝখান থেকে ভাঁজ করতে হবে (ছবি ৩)।
৪। এবার যেভাবে ৪ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে, সেভাবে ভাঁজ করা অংশদুটোকে আবার ভাঁজ করতে হবে।
৫। একদিকের ভাঁজ করা অংশটাকে এবার অন্যদিকেরটার উপর গোল করে তুলে দেব। এতে একটা শঙ্কুর মতো আকার পাওয়া যাবে।
৬। শঙ্কুর তলায় দুটো লেজের মতো অংশ বেরিয়ে থাকবে। ওদুটো ভাঁজ করে দিলেই হয়ে যাবে পাখির লেজ।
৭। এবার পাখির চোখ, ঠোঁট আর পায়ের অংশগুলো কাগজ কেটে তৈরি করে আঠা দিয়ে পাখির গায়ে জুড়ে দিতে হবে। সাদা গোলাকার কাগজে স্কেচপেন দিয়ে কালো চোখের মণি এঁকে নিতে পার।
৮। পাখির ছুঁচোলো মাথাটা একটু মুড়ে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে-কেটে দিলে পাখির ঝুঁটিও দেখতে পাবে।

বৈশালী সরকার

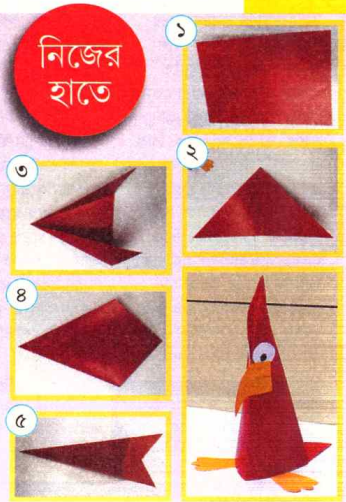

শীতের দুপুরের নরম রোদ জীবনে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলোর একটা। সেই নরম রোদে পিঠ দিয়ে কী করতে সবচেয়ে ভাল লাগে? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

পুজোর ঠিক পর থেকেই আমার মনের প্রজাপতিটা উড়তে থাকে, কারণ শীত আসতে চলেছে। শীতকাল মানেই ঘাম জবজবে স্কুলের ইউনিফর্ম থেকে রেহাই আর শীতকালের সকালের নরম রোদ। আহা! কী ভালই না লাগে। যখন বাগানের চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, পপি, প্যানসিগুলোর উপর ঠিক সকালের কমলা রংয়ের রোদ্দুরটা পড়ে, মনে হয় যেন কোনও পরির দেশে আছি আমি। মায়ের কাছ থেকে শোনা, দিদা যখন আউশ ধান থেকে তৈরি মোটা চালের ফেনাভাত নিয়ে বসে থাকত, তখন মা স্কুল থেকে ফেরার পর রোদ্দুরে পিঠ ঠেকিয়ে সেই ফেনাভাত খেত। তার মজাই নাকি ছিল আলাদা। আমি তার স্বাদ পাইনি অবশ্য। আমি শীতের নরম রোদে ছাদে থাকতে ভালবাসি। মাদুর পেতে দিদার কোলে শুয়ে থাকি। ঠাম্মা, দিদা আর আমি গল্প করি আর কমলালেবু খাই। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে মিশনের বাগান থেকে হরিয়ালগুলো উঁচু শিমুল গাছটায় বসে। তিলেমুনিয়ার ঝাঁক এক ঝোপ থেকে আর-এক ঝোপে যায়। কাঠশালিখগুলো দল বেঁধে কুলগাছটায় বসে। আমার মতো ওদেরও নরম রোদ ভাল লাগে, বুঝতে পারি।

শ্রীজা সরকার
চতুর্থ শ্রেণি, অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুল, বারাসত, ২৪ পরগনা।

তৃতীয়

শীতকালে অন্যান্য ঋতুর তুলনায় অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। ঘুরতে যাওয়া, ভূরিভোজ, নানা রকম মেলা, পিকনিক প্রভৃতি আনন্দের সম্ভার তো লেগেই থাকে। কিন্তু এত সবের মধ্যেও জীবনের প্রিয় জিনিসগুলোর মধ্যে একটা, অর্থাৎ শীতকালের নরম রোদে ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে মায়ের মুখে রামায়ণ, মহাভারত, গোপাল ভাঁড়ের গল্প শুনতে আমি খুব ভালবাসি। গল্প শুনতে-শুনতে মাঝে-মাঝেই চোখ চলে যায় আকাশের দিকে। দেখি নানা রংয়ের ঘুড়ি। পেটকাটি, বক্সা, চাঁদিয়াল, চিল একে অপরের সঙ্গে প্যাঁচ খেলছে। নীচে শোনা যাচ্ছে 'ভোকাট্টা'। মাঝে-মাঝে উত্তুরে হিমেল হাওয়া এসে শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। ঠিক তখনই সেই নরম রোদ এসে গা গরম করে দেয়। দেখতে-দেখতে সন্ধে হয়ে আসে। পশ্চিম আকাশে পড়ন্ত বেলার ডুবন্ত সূর্যর থেকে এক লাল ক্ষীণ আলো বেরতে থাকে। একঝাঁক পাখির কাকলি-কূজন সেই সৌন্দর্যের শোভা আরও বৃদ্ধি করে।

সিদ্ধার্থ রাজগয়ালী
চতুর্থ শ্রেণি, রবীন্দ্র বিদ্যামন্দির প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, হালিশহর।

দ্বিতীয়

এখন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই পড়ার চাপ অনেকটাই কম। শীতটাও খুব জাঁকিয়ে পড়েছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছেই করে না। মায়ের ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেলেও আরও কিছুক্ষণ লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি। গা ভেঙে নড়েচড়ে উঠতে-উঠতে বেশ অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। তারপর জলখাবার খেয়ে একটু লেখাপড়া, ছবি আঁকা এবং আবৃত্তি করি। তারপর দুপুরবেলা স্নান করে ভাত খেয়ে একটা মাদুর ও একটা বালিশ নিয়ে আমি আর ঠাকুমা ছাদে চলে যাই। আমার বাবা ছাদে অনেক গাছ লাগান। শীতকালে বাগান মরশুমি ফুলে ভরে যায়। দুপুরবেলা শীতে গরম রোদে পিঠ দিয়ে ঠাকুমার পাশে বসে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, পথের পাঁচালির গল্প, অপু-দুর্গার গল্প শুনতে-শুনতে, ছাদের বাগানে ফুল গাছে প্রজাপতির নাচ দেখতে-দেখতে, মৌমাছির ভনভনানি শুনতে-শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। মা হাতের কাজ শেষ করে আমাকে ডেকে নিয়ে যায় নীচে।

ঋদ্ধিমান বসু
তৃতীয় শ্রেণি, সরস্বতী শিশুমন্দির, পশ্চিম মেদিনীপুর।

চতুর্থ

শীতের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলোর একটা হল শীতের দুপুরের নরম রোদ। এই নরম রোদে পিঠ দিয়ে বসে মনে হয় যেন হাতে ধরা গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকি আমি। মনে হয়, ফেলুদার সব রহস্যের সমাধান যেন বইয়ের পাতায় বা টিভির পরদায় নয়, বরং একেবারে সামনাসামনি দেখেছি। বা শার্লক হোমস যেন ওয়াটসনকে নিয়ে তৈরিই হয়ে আছে, নতুন এক রহস্যের জন্য। ব্যোমকেশ বক্সীর অদৃশ্য চিঠি যেন আমাকে বলছে এক্ষুনি তাকে যেতে হবে নতুন রহস্যের পরদা সরাতে। কিংবা শঙ্কুর কোনও গোপন শত্রু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, শঙ্কুর বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। জয়ন্ত বা মিতিনমাসির নতুন রহস্যের মোড়ক যেন আমার সামনেই খুলবে। পড়ন্তবেলায় নরম রোদ কেটে গিয়ে অন্ধকার আকাশ আর উত্তুরে হাওয়া আমায় বাস্তবে নিয়ে আসে। তখন মনে হয় সবটাই তো কল্পনা! বাস্তবে হলে কত ভালই না হত। কী বলো তোমরা?

ভূমিশ্রী দাস
সপ্তম শ্রেণি, নবপল্লী যোগেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যামন্দির, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা।

পঞ্চম

শীতকাল তো সবারই কম-বেশি প্রিয়। শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে মনের মতো কাজ করতে কে না ভালবাসে। এই সময় আমার সবচেয়ে ভাল লাগে বাড়ির ছাদে মাদুর বিছিয়ে ঠাকুমার গা ঘেঁষে বসে নরম কাঁথামুড়ি দিয়ে পুরনো অ্যালবাম বারবার দেখতে। আর অ্যালবামের ছবিগুলো দেখতে-দেখতে ঠাকুমার মুখে সেইসব দিনের গল্প শোনা, সে আমার ভীষণ আনন্দের। বারবার শুনলেও ঠাকুমার কাছে বাবা আর জেঠুদের ছোটবেলার নানা দুষ্টুমির কথা শুনতে প্রতিবারই নতুন করে লাগে। আর ভাল লাগে ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে-করতে কমলালেবুর কোয়া মুখে নিয়ে নীল আকাশে রংবেরংয়ের ঘুড়ির কাটাকুটি খেলা দেখতে। আর ভাল লাগে মায়ের রোদে জরানো আমলকী মুখে নিয়ে প্রিয় গল্পের বইয়ে হারিয়ে যেতে।

বোধিমিত্র রায়
সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন (উঃ মাঃ), পশ্চিম মেদিনীপুর।

আরও যারা ভাল লিখেছে

সৃষ্টি ভট্টাচার্য
চতুর্থ শ্রেণি, নেভি চিলড্রেন স্কুল, কোলাবা, মুম্বই।

উষসী মুখোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি, মণিমালা গার্লস হাই স্কুল, আসানসোল।

ঋষিতা বসু
ষষ্ঠ শ্রেণি, অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।

স্বস্তিক মজুমদার
ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর।

অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত
অষ্টম শ্রেণি, নব নালন্দা হাই স্কুল, কলকাতা।

শ্রেয়া গুপ্ত রায়
অষ্টম শ্রেণি, সোদপুর সুশীলকৃষ্ণ শিক্ষায়তন ফর গার্লস, কলকাতা।

কল্পনা মিত্র
অষ্টম শ্রেণি, হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

প্রবাহনীল দাস
পঞ্চম শ্রেণি, অ্যাকমে আকাদেমি, কালনা, পূর্ব বর্ধমান।

অন্বেষা সেন
সপ্তম শ্রেণি, হোলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি।

সৃজিতা বল্লভ
দ্বিতীয় শ্রেণি, নলেজ হোম, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা।

রাজন্যা দত্ত
ষষ্ঠ শ্রেণি, তেহট্ট শ্রীদামচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, নদিয়া।

ঋদ্ধি দাস
অষ্টম শ্রেণি, বীরভূম জিলা স্কুল।

হৃষিতা পাল
পঞ্চম শ্রেণি, কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা।

সন্নিভ মাল
পঞ্চম শ্রেণি, পাঠভবন, ডানকুনি, হুগলি।

সুজন কর্মকার
পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন দেবারতি রায় মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

এবারের প্রতিযোগিতা

কান্নার সময় চোখ দিয়ে জল পড়াটাই খুব স্বাভাবিক। এমন কোনও জিনিসের নাম বলতে পারবে, যদি কান্নার সময় চোখ দিয়ে পড়ে, মনটা ভীষণ খুশি হয়? যারা ক্লাস ৮ থেকে এইটে পড়ো, লিখে পাঠাও ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা আর ইংরেজিতে। লেখার শব্দসংখ্যা ১৫০। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছাপব। খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, মনে করে লিখবে। ঠিকানা: 'খুদে প্রতিভা', 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

আমার স্কুলের খুদে প্রতিভা

আনন্দমেলা আয়োজিত এই স্কুলভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যার বিষয় ছিল 'আমার মনের মতো কেক'। এই সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল অনেক স্কুল, তাদের মধ্যে যে স্কুলগুলো খুব ভাল ফল করেছে, সেগুলো হল চিত্রশ্রী অঙ্কন কেন্দ্র, শ্রীরামপুর, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান, চিত্রভবন, শিলিগুড়ি, চিত্রকুঠি ড্রয়িং আকাদেমি, দমদম, আঁকা শেখা, চন্দননগর, রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল, কলকাতা, স্বর্ণিম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, দঃ ২৪ পরগনা, দেবাশিস দেবরায় আর্ট স্কুল, কলকাতা এবং সুদীপ পেন্টিং আকাদেমি, জগদ্দল। এছাড়াও আরও বহু স্কুল থেকে অসংখ্য অপূর্ব ছবি আমরা পেয়েছি এবং তাদের মধ্যে থেকে সেরা ছবি বেছে নিয়েছি, যেগুলো পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। স্কুলগুলো থেকে পাওয়া এন্ট্রি থেকে বেছে নেওয়া সেরা ১৫টি ছবি এই সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের নাম, শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের নামসহ প্রকাশ করা হল :

১. **অগ্নিমিত্রা রায়চৌধুরী**, *চতুর্থ শ্রেণি, চিত্রশ্রী অঙ্কন কেন্দ্র, শ্রীরামপুর।*
২. **সাম্যরূপ রুদ্র**, *চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।*
৩. **ঈশান মাঝি**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।*
৪. **অদ্বিতীয়া দাস**, *তৃতীয় শ্রেণি, রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল, কলকাতা।*
৫. **ময়ূখ সাহা**, *অষ্টম শ্রেণি, চিত্রভবন, শিলিগুড়ি।*
৬. **রাজদীপ পাল**, *অষ্টম শ্রেণি, চিত্রকুঠি ড্রয়িং আকাদেমি, দমদম।*
৭. **অঙ্কিত পান্ডা**, *অষ্টম শ্রেণি, আঁকা শেখা, চন্দননগর।*
৮. **মঞ্জিষ্ঠা কুন্ডু**, *দ্বিতীয় শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।*
৯. **তন্ময় চন্দ্র**, *তৃতীয় শ্রেণি, চিত্রকুঠি ড্রয়িং আকাদেমি, দমদম।*
১০. **ঐশীপর্ণা সাহা**, *পঞ্চম শ্রেণি, রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল, কলকাতা।*
১১. **সোহিনী ঢোলে**, *দ্বিতীয় শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।*
১২. **সোহম বসু**, *পঞ্চম শ্রেণি, স্বর্ণিম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, দঃ ২৪ পরগনা।*
১৩. **মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায়**, *তৃতীয় শ্রেণি, চিত্রভবন, শিলিগুড়ি।*
১৪. **নিকিতা খৈতান**, *সপ্তম শ্রেণি, দেবাশিস দেবরায় আর্ট স্কুল, কলকাতা।*
১৫. **খুশবু শ**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, সুদীপ পেন্টিং আকাদেমি, জগদ্দল।*

প্রথম

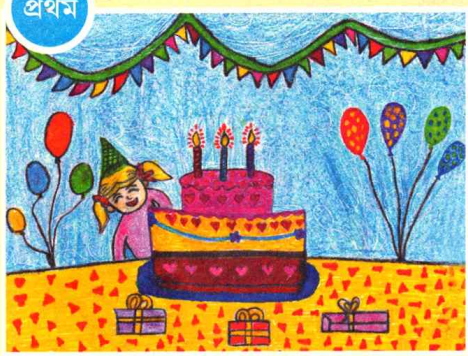

অগ্নিমিত্রা রায়চৌধুরী
চতুর্থ শ্রেণি
চিত্রশ্রী অঙ্কন কেন্দ্র, শ্রীরামপুর।

দ্বিতীয়

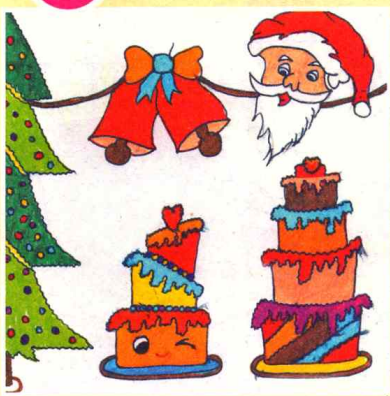

সাম্যরূপ রুদ্র
চতুর্থ শ্রেণি
সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।

তৃতীয়

ঈশান মাঝি
চতুর্থ শ্রেণি
সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।

চতুর্থ

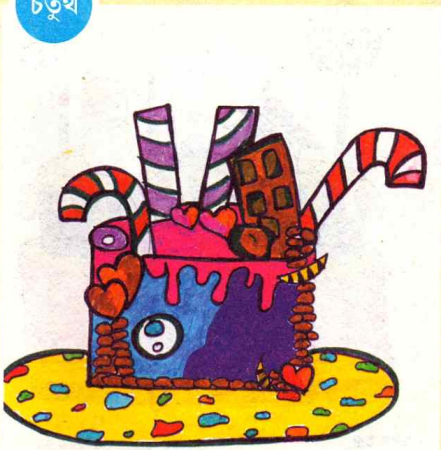

অদ্বিতীয়া দাস
তৃতীয় শ্রেণি
রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল, কলকাতা।

পঞ্চম

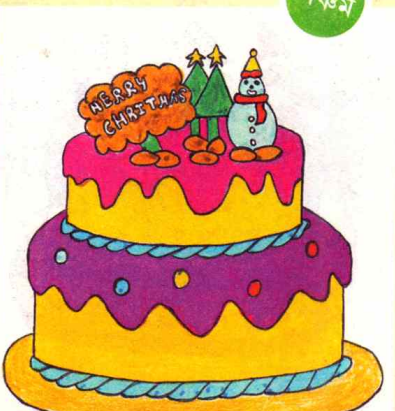

ময়ূখ সাহা
অষ্টম শ্রেণি
চিত্রভবন, শিলিগুড়ি।

ষষ্ঠ

রাজদীপ পাল
অষ্টম শ্রেণি
চিত্রকুঠি ড্রয়িং আকাদেমি, দমদম।

সপ্তম

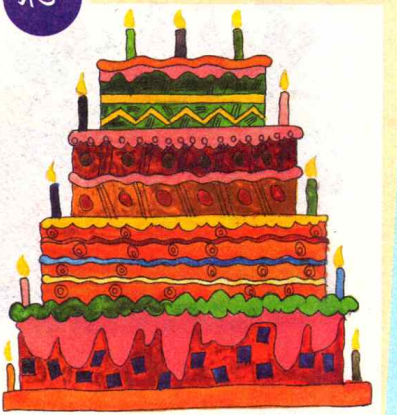

অঙ্কিত পান্ডা
অষ্টম শ্রেণি
আঁকা শেখা, চন্দননগর।

অষ্টম

মঞ্জিষ্ঠা কুন্ডু
দ্বিতীয় শ্রেণি
সেন্ট জ়েভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।

নবম

তন্ময় চন্দ্র
তৃতীয় শ্রেণি
চিত্রকুঠি ড্রয়িং আকাদেমি, দমদম।

দশম

ঐশীপর্ণা সাহা
পঞ্চম শ্রেণি
রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল, কলকাতা।

সোহিনী ঢোলে
দ্বিতীয় শ্রেণি
সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।

একাদশ

দ্বাদশ

সোহম বসু
পঞ্চম শ্রেণি
স্বর্ণিম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, দঃ ২৪ পরগনা।

ত্রয়োদশ

মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় শ্রেণি
চিত্রভবন, শিলিগুড়ি।

চতুর্দশ

নিকিতা খৈতান
সপ্তম শ্রেণি
দেবাশিস দেবরায় আর্ট স্কুল, কলকাতা।

পঞ্চদশ

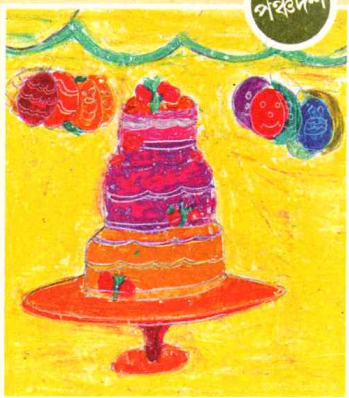

খুশবু শ
ষষ্ঠ শ্রেণি
সুদীপ পেন্টিং আকাদেমি, জগদ্দল।

আমার আনন্দ তোমারও হোক

এখন তো স্পোর্টসের মরশুম। গেনুর ভারী আহ্লাদের সময়। কেননা লেখাপড়ায় সে যতই মিয়ানো মুড়ি হোক না কেন, স্পোর্টসে সে একাই একশো। যে ক'টা ইভেন্টে নাম দেবে, প্রাইজ় এক্কেরে বাঁধা। ব্যাপারটা এখানেই যে শেষ, তা নয়। এই এন্তার প্রাইজ় নিয়ে সে বেচারা তিতিরকে উঠতে-বসতে ঠেস দিতে ছাড়ে না। তিতির বেচারার তাই এসময়টা খুবই মনখারাপ থাকে। সে প্রতি বছরই ভাবে, একটা কিছুতে তো সে-ও প্রাইজ় পেতে পারে। কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও একটা ইভেন্টেও 'মার দিয়া কেল্লা' করতে পারে না। তবে পারুক বা না পারুক, তা বলে কি সে গেনুর হ্যাটা খাওয়ার যোগ্য?

কখনওই নয়। এটা কিন্তু সব গেনুদের উদ্দেশে সাবধানবাণী। আর শুধু স্পোর্টসেই এই সতর্কীকরণ সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের সব পরিসরেই প্রযোজ্য। তুমি যদি কোনও ক্ষেত্রে খুব ভাল ফল করো, তা হলে এই মানে দাঁড়ায় না, যে ছেলে বা মেয়েটি সেই ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে, তাকে ব্যঙ্গ করার কোনও অধিকার তোমার আছে? তা যদি করো, তা হলে তুমি কিন্তু খারাপ মানুষ। এর সপক্ষে অনেক যুক্তির দু'-একটি কথা তো বলাই যায়। তোমার আজকের যে সাফল্য, তা যে চিরকালীন, তা তো নয়! কাল তা অন্য কারও হতে পারে। তাই সাফল্য নিয়ে গর্ব করা বোকামির লক্ষণ। আর প্রধান যুক্তিটি হল, খেলায় যে ছেলে বা মেয়েটি তোমার পিছনে পড়ছে, হয়তো লেখাপড়া বা গান বা আবৃত্তিতে সে-ই তোমার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসনীয় পারফর্ম করে। তা হলে? হয়তো তুমি দারুণ স্পোর্টসম্যান। কিন্তু পরে যখন তুমি হেঁড়ে গলায় গান গাইবে, তিতির খুকখুক করে হেসে উঠলে ভাল লাগবে? তাই সবসময় হুঁশিয়ার থাকবে, তোমার আনন্দ যেন অহংকারের রূপ না নেয়। কে না জানে অহংকারই যে উপহাসের জন্মদাতা! আনন্দটুকু উপভোগ করো মন-প্রাণ ভরে, তবে তা অন্যের সম্মান নুইয়ে নয়।

আমার বই

আমার ছেলেবেলা

বুদ্ধদেব বসুর নাম কি কেউ শুনেছ? না শুনে থাকলে কিন্তু খুব ক্ষতি হয়েছে। বাংলা ভাষার এক মস্ত বড় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, যিনি প্রধানত বড়দের জন্য লিখলেও তাঁর কিছু অনবদ্য বই রয়েছে ছোটদের জন্যও। বাংলা ভাষার এক প্রধান লেখক তিনি, তাঁর অসামান্য কবিতা ও প্রবন্ধের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়তো হবে বড় হয়ে, তার আগে ছোটবেলাতেই স্বাদ নিয়ে নাও তাঁর অপূর্ব হাতযশের। তা হলে গ্রহণ করার ভূমি প্রস্তুত হয়ে যাবে আগেই। আবছা হলেও ছোট থাকাকালীনই ধারণা হবে বাংলা সাহিত্যের খনি কতটা সুফলা ও ঐশ্বর্যময়।

বইয়ের নামটি শুনেই নিশ্চয়ই বোঝা যায় লেখক তাঁর ছেলেবেলার কথাই লিখেছেন। তা ঠিক। তবে সব স্মৃতিকথনই আলাদা। মূলত লেখকের ভিন্ন দৃষ্টি ও সৃষ্টির তারতম্যে। ছেলেবেলার কথায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে অজস্র স্বপ্নের কুঁড়ি। এ বই তার ব্যতিক্রম নয়, তবে তা অন্য মাত্রা পেয়েছে অনবদ্য লেখনীর প্রসাদগুণে। পড়তে-পড়তে চোখের সামনে জীবন্ত দেখা যায় গত শতকের গ্রামবাংলার আশ্চর্য রূপকথাদের। দেখবে, নিছক সাধারণ ঘটনাও বর্ণনার গুণে হয়ে উঠতে পারে কী অসামান্য চিত্ররূপময়, ঐশ্বরিক! এই বই একইসঙ্গে ইতিহাসের ছোট্ট একটুকরো নথিও বটে। 'রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম চোখে দেখেছিলাম বুড়িগঙ্গার উপর নোঙর-ফেলা একটি স্টিম-লঞ্চে,' নিঃসন্দেহে শিহরণ জাগবে এসব লাইন পড়ে। বইটি তাই শুধুই এক ব্যক্তিমানুষের স্মৃতিকাহন হয়ে থাকেনি, লেখকের বৈদগ্ধ্যের ছোঁয়ায় একাধারে হয়ে উঠেছে দেশ ও কালের নির্ভরযোগ্য আয়না, মহৎ সাহিত্যের ধর্মই যা। এতগুলো কারণের জন্য ছোট বয়সে পড়লেও এই বইয়ের হাত হয়তো মনে-মনে তোমরা ধরে রাখবে অনেক বড় বয়সেও। এর পরও কি একবার পড়ে দেখবে না? আগ্রহের সলতেটা উসকে দেওয়ার জন্য শেষে দেওয়া থাকল ছোট্ট একটি অংশ...

'কিন্তু এই ধ্বংসপরায়ণ মেঘনাই নোয়াখালিকে দিয়েছিলো তার সংবৎসরের শ্রেষ্ঠ দৃশ্য, বৃহত্তম ঘটনা— তার ডার্বি, তার রথের মেলা, তার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ফাইনেল। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের অমাবস্যায়, মধ্যাহ্নের কোনো-এক লগ্নে সমুদ্র থেকে বান আসে নদীতে— স্থানীয় ভাষায় বলে 'শর'। ঘরে-ঘরে সেদিন সকাল থেকে চাঞ্চল্য, একটা উৎসবের ভাব। আমার যতদূর মনে পড়ে, স্কুলগুলোতে ছুটি থাকতো কিছুক্ষণ, কাচারি-আদালতেও কাজকর্ম স্থগিত— সেই সময়টুকুর জন্য সকলেই সেদিন নদীর ধারে...'

সুদেষ্ণা ঘোষ

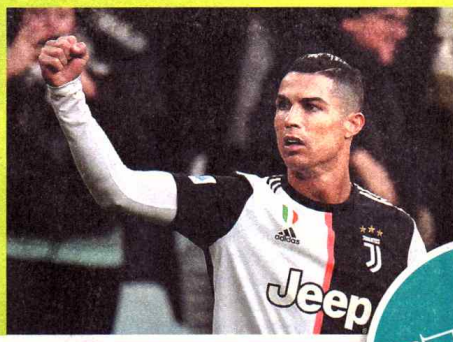

রোনাল্ডোর বাজিমাত

সম্প্রতি জুভেন্তাসের হয়ে হ্যাটট্রিক করে নতুন নজির গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর কীর্তির কথা লিখেছেন **জয়াশিস ঘোষ**

খেলা যে মাঠেই হোক না কেন, ফুটবলারের পা যতদিন তাঁকে সঙ্গ দেবে, কোনও মাঠই তাঁর কাছে কঠিন নয়। বছরের শুরুতে এই কথাটাই যেন প্রমাণ করে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশাল দামে রিয়েল মাদ্রিদ থেকে জুভেন্তাসে এসেছেন বেশ কিছুদিন আগে। নিজের দামের যোগ্য মর্যাদা রেখে গোলও করেছেন প্রচুর। তবু ভক্তদের মনে কোথাও একটা খচখচানি যেন থেকেই গিয়েছিল। সবই আছে। তবু কী যেন নেই। সেই খচখচানিটাই সি আর সেভেন যেন এক নিমেষে উড়িয়ে দিলেন নতুন বছরের গোড়াতেই।

কী করেছেন তিনি? করেছেন একটা হ্যাটট্রিক। হ্যাঁ, সাদা-কালো জার্সি গায়ে একটি ম্যাচে তিনটি গোল। সেই ম্যাচে জুভেন্তাসের প্রতিপক্ষ ছিল ক্যাগলিয়ারি। খেলার ফলাফল হয়েছিল ৪-০। রোনাল্ডো ছাড়া জুভেন্তাসের হয়ে আর-একটি গোল দিয়েছিলেন গঞ্জালো হিগুয়েন।

হ্যাটট্রিক করা রোনাল্ডোর কাছে কোনও নতুন ব্যাপার নয়। তা হলে কেন হঠাৎ এই হ্যাটট্রিক নিয়ে এত মাতামাতি? কারণটা চমকে দেওয়ার মতো। এবার নিয়ে রোনাল্ডো নিজের ফুটবল কেরিয়ারে ৫৬ বার হ্যাটট্রিক করলেন। সেটা শুধু রোনাল্ডোর একার নয়, ফুটবল ইতিহাসেও একটা রেকর্ড।

রোনাল্ডোর কেরিয়ারগ্রাফের দিকে তাকালে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন, তিনি এমন একজন ফুটবলার যিনি বারবার বিশেষজ্ঞদের ভুল প্রমাণ করে ছেড়েছেন। যখনই মনে হয়েছে এবার বোধ হয় রোনাল্ডো শেষ, তখনই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এবারেই যেমন। কিছুদিন আগেই ষষ্ঠবার ব্যালন ডি'ওর জিতেছেন রোনাল্ডোর চিরপ্রতিপক্ষ মেসি। সেই নিয়ে চলছে তুমুল হইচই। এই পরিস্থিতিতে রোনাল্ডো অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছেন। মেসিকে নিয়ে সেই হইচই এবার চাপা দিয়ে দিলেন রোনাল্ডো। এমন এক রেকর্ড করলেন যে, চমকে উঠল ফুটবল দুনিয়া। কী করে নিজের দিকে নজর ঘোরাতে হয়, তিনি তা ভালই জানেন।

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, মেসির ব্যালন ডি'ওর যেন রোনাল্ডোকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। একটা ছোট্ট ঘটনাই যেন তার প্রমাণ।

ব্যালন ডি'ওর অনুষ্ঠানের পরপরই একটি ম্যাচে প্রায় আড়াই ফুটের বেশি উচ্চতায় লাফিয়ে উঠে হেড দিয়ে একটা গোল করেন রোনাল্ডো। সেই গোল হতবাক করে দিয়েছে প্রবল মৈসিভক্তদেরও।

৩৪ বছর বয়সেও তাঁর এই ক্ষিপ্রতা, শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। ভক্তদের কাঙ্ক্ষিত হ্যাটট্রিক উপহার দেওয়ার কয়েকদিন পরেই ফুটবলদুনিয়া অবাক হয়ে দেখেছে তাঁর চোখধাঁধানো ড্রিবল। মাত্র দু'বার পা ছুঁইয়ে বল কেড়ে নিয়ে গোলমুখো তাঁর সেই দৌড় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিপক্ষের ব্রিটিশ ডিফেন্ডার ক্রিস স্মলিংও।

তবে এমন রেকর্ড করার পরও রোনাল্ডো বিশেষ স্বস্তিতে নেই। কারণ? রোনাল্ডোর পর সবচেয়ে বেশি হ্যাটট্রিকের রেকর্ড রয়েছে কিন্তু সেই মেসিরই। ৫২টি। মাত্র চারটি হ্যাটট্রিক দূরে রয়েছেন মেসি। কে বলতে পারে, মেসি এবছরই টপকে যাবেন না রোনাল্ডোকে?

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

দাবায় হাম্পির চমক

মা হওয়ার পর খেলার দুনিয়ায় ফিরে এসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির কম নেই। টেনিস তারকা মার্গারেট কোর্ট, কিম ক্লিস্টার্স থেকে আমাদের কিংবদন্তি বক্সার মেরি কম। সদ্য দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে সেই তালিকায় ঢুকে পড়লেন ভারতীয় দাবাড়ু কনেরু হাম্পি। শারীরিক কারণে গত দু'বছর প্রতিযোগিতামূলক দাবা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু লড়াইয়ে ফিরে এসে চমকে দিয়েছেন দেশের ৩২ বছরের এই তারকা দাবাড়ু। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার মেয়ে হাম্পি ২০০২ সালে গ্র্যান্ডমাস্টার হন। ২০০৬ সালে দোহা এশিয়ান গেমসে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জেতা ছাড়াও দলগত মিক্সড ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন। বর্তমানে হাম্পির এলো রেটিং ২৫৮০। তবে জুডিথ পোলগারের পর ২০০৭ সালে বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা দাবাড়ু হিসেবে ২৬০০-র বেশি এলো রেটিংয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন হাম্পি। মস্কোয় বিশ্ব র‍্যাপিড দাবায় চিনা খেলোয়াড়কে টাইব্রেকারে উড়িয়ে দিয়ে অবিশ্বাস্য জয় তুলে নেন হাম্পি। বিশ্বনাথন আনন্দের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় দাবাড়ু, যিনি বিশ্বখেতাব জিতে প্রচারের আলোয়।

ক্রিকেটকে ইরফানের বিদায়

এক সময়ের সাড়াজাগানো ক্রিকেটার। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক, তখনই ঘটেছিল তাঁর টেস্ট অভিষেক। ভারতীয় দলের সেই প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান এবার সব ধরনের ক্রিকেট থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। বাইশ গজের লড়াইয়ে আর তাঁকে বল হাতে দৌড়ে আসতে দেখা যাবে না। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রোফিতে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন বরোদার ৩৫ বছরের এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার। দেশের ২৯টি টেস্টে ১০০ উইকেট নিয়ে ১১০৫ রান করেছেন। একদিনের ক্রিকেটে পেয়েছেন ১৭৩ উইকেট। ব্যাটে করেছেন ১৫৪৪ রান। ২৪টি টি২০ ম্যাচে পেয়েছেন ২৮ উইকেট। ২০০৬ সালে করাচিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত হ্যাটট্রিক, ২০০৭ সালে এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার ইরফানের ক্রিকেটজীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

বিনেসের চোখ টোকিয়োয়

হরিয়ানার ২৫ বছরের কুস্তিগির বিনেস ফোগতের চোখ এখন টোকিয়োর দিকে। আর কয়েক মাস পরেই জাপানের টোকিয়ো শহরে বসবে অলিম্পিক্সের আসর। গত বছরের শেষ দিকে কাজাখস্তানে বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন বিনেস। পেয়ে যান টোকিয়ো যাওয়ার ছাড়পত্র। ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা পান। এই বছরেই জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ৫০ কেজিতে জিতেছিলেন সোনা। বিনেসই প্রথম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির, যিনি এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমস, দু'টিতেই সোনা জিতেছেন। অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেও হাঁটুর চোটের জন্য তাঁকে ছিটকে যেতে হয়েছিল। এবার তাই পদক চান বিনেস।

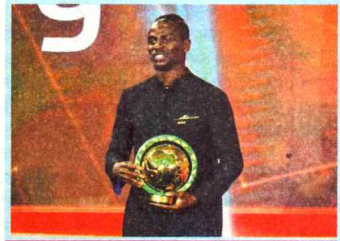

বর্ষসেরা ফুটবলার মানে

দুরন্ত ফুটবল খেলছেন তিনি। আর তার সুবাদেই এই প্রথম বর্ষসেরা আফ্রিকান ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন সেনেগালের সাদিয়ো মানে। ২৭ বছরের এই ফরোয়ার্ড ক্লাব ফুটবল খেলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল লিভারপুলের হয়ে। এই দলেই খেলেন ইজিপ্টের মহম্মদ সালাহ। ক্লাব ফুটবলের সতীর্থ সালাহকে পিছনে ফেলে ফুটবলজীবনে প্রথমবার এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত সাদিয়ো। শুধু সালাহই নন। বর্ষসেরার দৌড়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আলজিরিয়ান তারকা রিয়াদ মাহেজকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন মানে। লিভারপুলকে চ্যাম্পিয়নস লিগ এনে দেওয়ার সঙ্গে দেশকে আফ্রিকান নেশন কাপের ফাইনালে তুলেছিলেন মানে। ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপে ছিলেন সেনেগালের ফুটবলার। ২০০১ এবং ২০০২ সালে পরপর দু'বছর আফ্রিকান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার হয়েছিলেন সেনেগালের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার এল ডিউফ। গত দু'বারের বর্ষসেরা সালাহকে হারিয়ে এবার সেই সম্মান আবার সেনেগালে নিয়ে গেলেন মানে।

ফেরার লড়াইয়ে শারাপোভা

একসময়ের বিশ্বসেরা টেনিসতারকা তিনি। তাঁর সাফল্যের ঝুলিতে রয়েছে পাঁচ-পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব। কিন্তু ২০১৬ সালে অস্ট্রেলীয় ওপেনে ডোপ টেস্টে ধরা পড়ার পর ১৫ মাসের নির্বাসন রুশ টেনিসতারকা মারিয়া শারাপোভার টেনিস জীবন অনেকটাই বদলে দেয়। নির্বাসন কাটিয়ে ২০১৮ সালে কোর্টে ফিরলেও সেভাবে সাফল্যের মুখ দেখেননি তিনি। গত অগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে সেরিনা উইলিয়ামসের কাছে প্রথম রাউন্ডে হেরে যাওয়ার পর আর কোর্টে ফেরেননি। কাঁধের চোট হয়ে উঠেছিল আরও বড় বাধা। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে নামতে-নামতে নতুন বছরের শুরুতে ১৪২ নম্বরে নেমে গিয়েছেন তিনি। জানুয়ারির ২০ তারিখ এবছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলীয় ওপেন শুরু। ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে মেলবোর্নে এই প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন শারাপোভা। অস্ট্রেলীয় ওপেনের আগে ব্রিসবেন ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে খেলতে নামলেও প্রথম রাউন্ডে ছিটকে যান ৩২ বছরের এই প্রাক্তন বিশ্বসেরা তারকা। তবে ফেরার লড়াইয়ে নেমে পিছনের দিকে তাকাতে চান না শারাপোভা। বরং নতুন করে সাফল্য ছুঁতে চান তিনি।

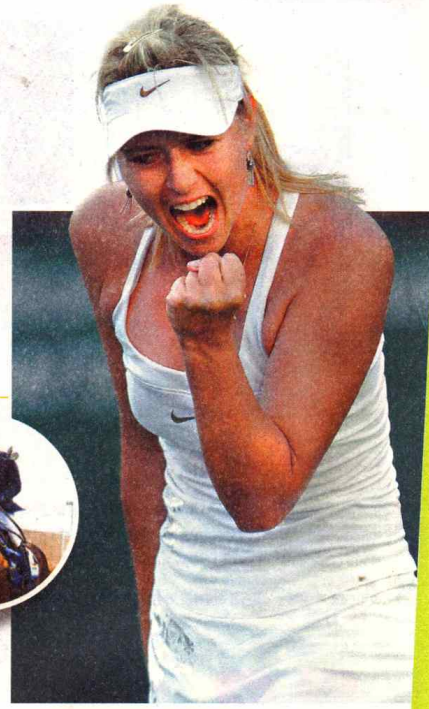

অলিম্পিক্‌সের অশ্বারোহণে ফৌয়াদ

প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন জোরকদমে। প্রায় দু'দশক পর টোকিয়ো অলিম্পিক্‌সে ভারতের কোনও প্রতিযোগী অশ্বারোহণে অংশ নেবেন। বেঙ্গালুরুর ফৌয়াদ মির্জা অলিম্পিক্‌সের টিকিট পেয়ে তাই খুশি। এর আগে ২০০০ সালে সিডনি অলিম্পিক্‌সে শেষ কোনও ভারতীয় অশ্বারোহী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন ইমতিয়াজ আনিস। ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে জোড়া রুপোর পদক জিতে নজর কেড়ে নেন ফৌয়াদ। ব্যক্তিগত বিভাগে পদকজয়ের পর দলগত বিভাগেও দেশকে পদক এনে দিতে বড় ভূমিকা নেন তিনি। এই সাফল্যেই গত বছর পান অর্জুন পুরস্কার। এশিয়াডের মতো অলিম্পিক্‌সের আসরেও ফৌয়াদ সফল হতে পারেন কিনা, এখন সেটাই দেখার।

হাতেকলমে টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ

ওরা কেউ এই প্রথম টেবিল টেনিস খেলতে শিখল। কেউ খেলা শুরু করলেও আরও ভাল করে শিখে নেওয়ার সুযোগ পেল। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতা জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার উদ্যোগে চার থেকে আট বছরের খুদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে হয়ে গেল ইন্ডিয়ান অয়েল মন্টেসরি শীতকালীন টেবল টেনিসের প্রশিক্ষণ শিবির। অংশ নিল ৬০ জন খুদে শিক্ষার্থী। বাঘা যতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘ, চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার এবং বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটে ১৫ দিন ধরে পাঁচজন প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণে চলল এই শিবির। একেবারে হাতে-কলমে টেবিল টেনিসের অ আ ক খ শিখে নিল আরণ্যক, ভাস্বতী, শৌনক, রাজন্যা, অয়ন্তিকারা। মা বৈশালীর হাত ধরে এই শিবিরে এসে পাঠভবন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র অভিনিবেশ দাস দেখিয়ে দিল, ঠিক কীভাবে র‍্যাকেট ধরতে হয়। অবৈতনিক এই প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয় বিবেকানন্দ মিলন সংঘে। সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠান হল সি এল টি-তে। আয়োজক সংস্থার পক্ষে প্রবীণ টেবল টেনিস কর্তা রবি চট্টোপাধ্যায় বললেন, "২০১২ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সায়নী পান্ডা এখন টেবিল টেনিসের পরিচিত মুখ।" সায়নী ছাড়াও শিবিরের খুদে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে এসেছিলেন দেশের দুই নামী টেবিল টেনিস খেলোয়াড় কৃত্তিকা সিংহরায় ও সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি, প্রদীপ চৌধুরীরা। শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

চন্দন রুদ্র

ফোটো: লেখক

নতুন খেলা

১

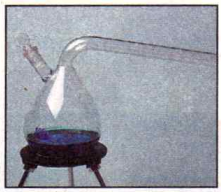

৩

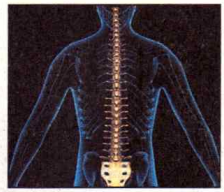

২

৪

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এবারের সঙ্কেত : বইপত্র প্রদর্শনী ও বিক্রি করার জন্য অস্থায়ী স্থান।

১			
২			
৩			
৪			

র	সা	য়	ন
বি	দ্যা	ল	য়
বা	গ	দে	বী
র	থ	যা	ত্রা

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান

র বি বা র

Go Figure

÷ × + −

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

সহজ

							= ১৪
৪		৩		২		১	

মাঝামাঝি

							= ২২
৪৬		২৩		৫		৪	

কঠিন

							= ৬০
৬১		৫৮		১৯		৩	

২০ ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান :

সহজ : (৬ + ৭ + ৮) ÷ ৩ = ৭
মাঝারি : ২ × ৯ ÷ ৩ × ৪ = ২৪
কঠিন : (৩৭ - ২) × (২১ - ১৯) = ৭০

তৃষা সাঁতরা, সপ্তম শ্রেণি, বড়া মধুসূদন বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি। **তমোশ্রী কোলে**, পঞ্চম শ্রেণি, বড়া মধুসূদন বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি। **অভীক দাস**, চতুর্থ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শিশু সদন, মালদা। **মনীষী দে**, সপ্তম শ্রেণি, গড়বেতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পঃ মেদিনীপুর। **রাজর্ষি দাস**, চতুর্থ শ্রেণি, বারাসত মহাত্মা গাঁধী স্মৃতি জি এস এফ পি বিদ্যালয়, বারাসত। **শ্রী দত্ত**, পঞ্চম শ্রেণি, হোলি ক্রস স্কুল, বারুইপুর। **বিবর্ত বেরা**, সপ্তম শ্রেণি, শিবপুর শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়, হাওড়া। **পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়**, অষ্টম শ্রেণি, মাজিনান নব বিদ্যালয়, গুড়াপ। **গৌরব দে**, সপ্তম শ্রেণি, **অর্ক পাল**, অষ্টম শ্রেণি, নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়, নদিয়া। **স্বাগতা রায়, শ্রেবন্তী রায়**, পঞ্চম শ্রেণি, রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়, বারুইপুর। **শিবাজি রায়**, *পঞ্চম শ্রেণি, বারুইপুর হাই স্কুল।*

আমাদের চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থসম্ভার!!

Stall No. 341, 109, 277

এছাড়া ছোটোদের উপযোগী বিভিন্ন ইংরেজি ও বাংলা গল্পের বই (রঙিন সংস্করণ)

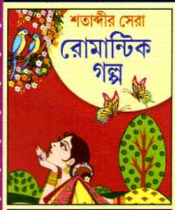

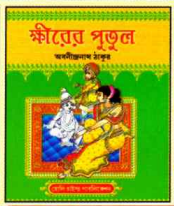

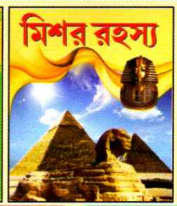

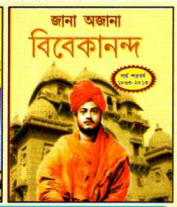

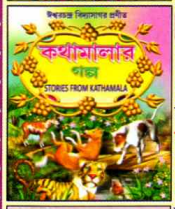

ছোটোদের গল্প

ছোটোদের টুনটুনির বই	৯০/-
ছোটোদের বীরবলের গল্প	৯০/-
ঠাকুমার ঝুলি	৯০/-
রসিকরাজ গোপাল ভাঁড়	৯০/-
ছোটোদের ঈশপের গল্প	৮০/-
ছোটোদের পঞ্চতন্ত্রের গল্প	৮০/-
সব সেরা হাসির গল্প	৯০/-
সব সেরা ভূতের গল্প	৯০/-
অচেনা অজানা আমাজন	৭৫/-
অচেনা অজানা আন্টার্কটিকা	৭৫/-
রহস্যময় ডাইনোসর	৭৫/-
মিশর রহস্য	১০০/-
ছোটোদের রঙিন রামায়ণ	৯০/-
ছোটোদের রঙিন মহাভারত	১০০/-

রচনা সমগ্র

গল্পগুচ্ছ ১৭০	গীতবিতান ১৭০
রবীন্দ্র উপন্যাস (১/২) ১৭০	
সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র সংগীত স্বরলিপি	
৪০০ বিদ্যাসাগর রচনাবলি (১/২)১৭০	
শরৎ রচনাবলি (১/২/৩)১৮০	
বঙ্কিম রচনাবলি (উপন্যাস খণ্ড)২০০	
বঙ্কিম রচনাবলি (সাহিত্য খণ্ড) ৩০০	
বিভূতিভূষণ উপন্যাস সমগ্র (১/২)২৫০	
শেক্সপীয়র রচনা সমগ্র ২০০	
উপেন্দ্র কিশোর রচনা সমগ্র ২৫০	
বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১/২)২০০	
জুল ভার্ন রচনা সমগ্র পৃথ্বীরাজ সেন২০০	
জিম করবেট রচনা সমগ্র ২০০	
গল্প সমগ্র প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ৩০০	

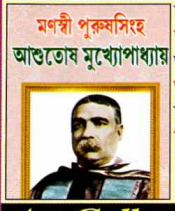

Art Gallery

অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নিশ্চিত সাফল্যের জন্য অবশ্যই সংগ্রহ করুন

- Subject Drawing
- Pastel Drawing
- Pencil Drawing
- Indian Art & Painting
- Water Colour Composition
- Jamini Roy
- Portrait · Human Figure & Animal with Birds.

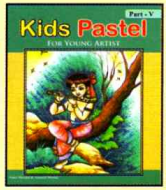

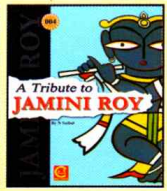

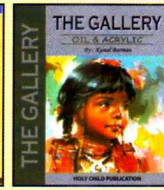

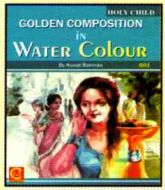

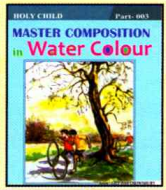

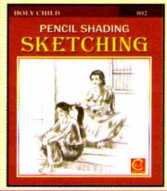

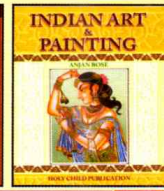

HOLY CHILD PUBLICATION / S.B.S. PUBLICATION

e-mail : holychildpublication@yahoo.com ★ Website : www.holychildpublication.co.in

32 & 30/1, Beniatola Lane, Kol-9 ★ Ph : 8648851504/ 8648851506 6289199827